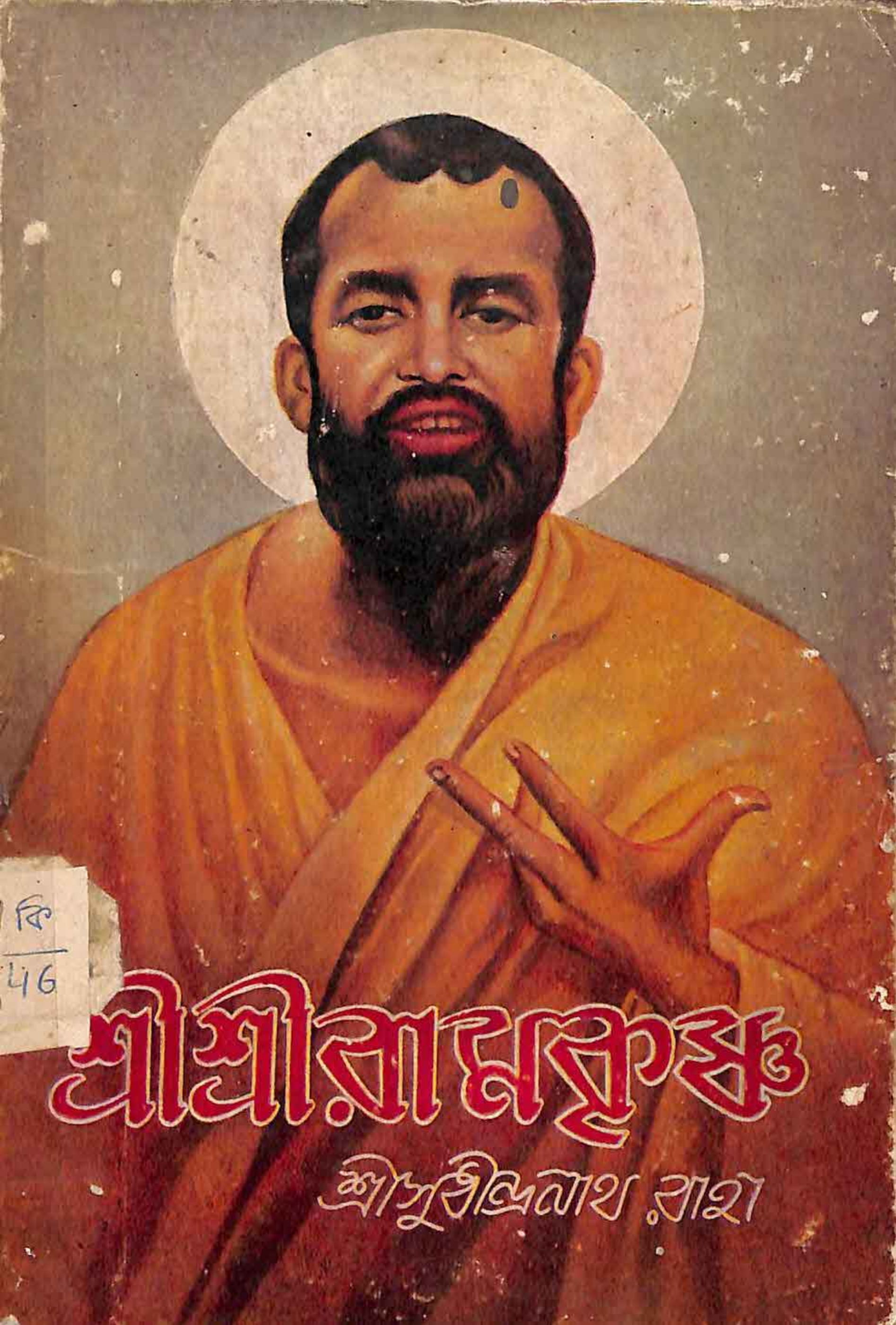

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অমর-প্রতিভা-সিরিজ



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রায়

প্রকাশক—
শ্রীসুবোধচন্দ্র সুর
২৫, ভুপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা—৪

প্রথম মুদ্রণ
১৩৫৬

মুদ্রাকর—সাগরচন্দ্র দত্ত
নারায়ণ প্রেস
৯২-সি বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বারো আনা


উপহার

অমর-প্রতিভা-সিরিজ

রূপায়িত ক'রেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

(কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠাতা)

শরৎ সাহিত্য ভবন





শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

(১)

হুগলী জেলার এক কোণে ছোট্ট একটুখানি গ্রাম, নাম তার কামারপুকুর। এই ছোট্ট গ্রামে বাংলা ১২৪১ সালে এক বিরাট পুরুষ জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। তখন ফাল্গুন মাস, বসন্তের হাওয়ায় আম্রমুকুলের গন্ধ ছড়িয়ে প'ড়েছে চারিদিকে। এই সদ্যোজাত মানবকের যশঃসৌরভও যে একদিন সারা পৃথিবীতে অমনিভাবে ছড়িয়ে প'ড়বে, তা কে জা'নত সেদিন?

শিশুর দু'টি নাম—সবাই ডাকে গদাধর ব'লে। পোষাকী নাম হ'ল রামকৃষ্ণ,—যে নাম পরে ত্রিশকোটী ভারতবাসীর জপমালা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল গদাধরের বাপ ক্ষুদিরাম



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

ছিলেন ভগবান রামচন্দ্রের ভক্ত। তাই সন্তানদের নামের আগে 'রাম' শব্দ যোগ না করে তিনি খুসী হ'তে পারতেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামকুমার, মধ্যমের নাম ছিল রামেশ্বর।

ক্ষুদিরাম গরীব ব্রাহ্মণ। কিন্তু গরীব হ'লেও তিনি ধর্ম-ভীরু, এবং তেজস্বী। অন্যায় সহ্য করা তাঁর স্বভাব ছিল না। নিজে ত অন্যায় মেনে নিতে রাজী ছিলেনই না, অন্য কারও উপর অন্যায় হ'তে দেখলে তিনি তার প্রতিবাদ করতে দ্বিধা ক'রতেন না। এমনি একটা ঘটনায় গ্রাম্য জমিদারের সঙ্গে বিবাদ হ'য়ে যায় তাঁর। তখন তিনি বর্দ্ধমানের বার-তের ক্রোশ দূরবর্ত্তী 'দেরে' গ্রামে বাস ক'রতেন। জমিদারের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার ফলে তিনি দেশত্যাগ করলেন, তবু মাথা নীচু করলেন না অত্যাচারীর কাছে। 'দেরে' গ্রামের বাস উঠিয়ে দিয়ে গরীব ব্রাহ্মণ এসে কুঁড়ে বাঁধলেন— কামারপুকুরে। এই কামারপুকুরই হ'ল রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান।

পাঁচ বৎসর বয়সে গদাধরকে পাঠশালায় দেওয়া হল। পড়ায় তাঁর মনোযোগ মোটেই নেই। তিনি গান করে সময় কাটিয়ে দেন, আর তা না হ'লে নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে কি যেন চিন্তা করেন। মাতা চন্দ্রমণি শিশুকে ওজন্য তাড়নাও করেন না। শিশুর চাঁদমুখ দেখলেই তাঁর চিত্ত আনন্দে বিভোর হ'য়ে যায়, ছেলের পড়াশুনার কথা তাঁর

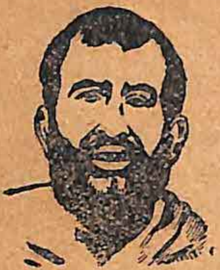
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



আর মনে থাকে না।

পড়াশুনায় মন না থা'ক্, একদিকে আগ্রহের কিন্তু গদাধরের সীমা ছিল না। নিজের হাতে দেবতার মূর্ত্তি তৈরী ক'রে নিজের ইচ্ছামত মনগড়া মন্ত্রে এবং যা-তা উপকরণে সেই দেবতার যখন-তখন পূজা করা ছিল তাঁর একমাত্র আনন্দের জিনিষ। ক্ষুদিরামের রামভক্তের সংসার। কাজেই রামচন্দ্রের মূর্ত্তি পূজার দিকেই তাঁর সর্বপ্রথম ঝোঁক এসেছিল। রঘুবীরের এক মাটির মূর্ত্তি গ'ড়ে তার গলায় ফুলের মালা দুলিয়ে দিতেন গদাধর। ফুল দিয়ে পা-দু'খানি ঢেকে জোড় হাতে তাঁর সম্মুখে ব'সে বিড়-বিড় ক'রে কী যেন ব'লতেন তিনি। কখনো-বা স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ধ্যানস্থ হয়ে যেতেন গদাধর। মন তাঁর ছুটে যেত কোন্ সত্যলোকে, ঈপ্সিত দেবতার চরণকমলের গন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে।

এই ভাবেই বড় হ'য়ে উঠলেন গদাধর। পড়াশুনা সামান্যই হ'ল। গ্রামে তার সুযোগও কম ছিল, সে দিকে পড়ুয়ার আগ্রহও ছিল ততোধিক কম। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি সেই বয়স থেকেই সুরু হ'য়ে গেল যখন তাঁর বয়স মাত্র দশ এগারো বৎসর, সেই সময় একদা এক মাঠ পার হ'য়ে বালক গদাধর পার্শ্ববর্তী গ্রাম আনুড়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মাঠের ভিতর তিনি একটা স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখতে পেলেন। সে জ্যোতি দেখতে-দেখতে তাঁকে ঘিরে ধ'রল। তাঁর দুই চোখের ভিতর দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ ক'রল যেন সেই জ্যোতি, ভয়ে-পুলকে অভিভূত হ'য়ে বালক



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

মুচ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলেন সেই প্রান্তরে। অবশ্য অল্পক্ষণ পরেই তাঁর চৈতন্য ফিরে এল, এবং তাঁর এ অপূর্ব অভিজ্ঞতার দরুণ অন্তরে একটা বিপুল আনন্দ ছাড়া আর কোন-কিছুরই ছাপ প'ড়ে রইল না।

এইভাবে দিন যায়। হঠাৎ দরিদ্র সংসারে একটা দারুণ বিপর্য্যয় ঘ'টে গেল। ক্ষুদিরাম স্বর্গগমন ক'রলেন। সংসার কি ক'রে চ'লবে, এই চিন্তায় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। তিনি অনেক চিন্তা ক'রে স্থির ক'রলেন—সবাইকে গ্রামে রেখে ক'লকেতায় আসবেন অর্থ উপার্জনের চেষ্টায়। কার্য্যকালে কিন্তু গদাধরও দাদার সঙ্গে চ'লে এলেন। সেটা বাংলা ১২৫৬ সাল, তখন গদাধরের বয়স মাত্র পনরো বৎসর।

মহানগরীতে এসে রামকুমার খুললেন ছোট্ট একখানি টোল—ঝামাপুকুরে, দু'চারটি পড়ুয়া জুটল। তখনও সংস্কৃত পড়ার দিকে কারও-কারও ঝোঁক ছিল। ইংরেজী পড়ার পেষণে দেবভাষার চর্চা একেবারে বিলুপ্ত হয়নি দেশ থেকে। গদাধরও অলস হ'য়ে ব'সে রইলেন না। দেবদেবীর পূজার দিকে তাঁর অন্তরের আগ্রহ ত চিরদিন ছিলই, তিনি ঐদিকে একটা কাজ সহজেই পেয়ে গেলেন। প্রথমে নাথের বাগানে, পরে ঝামাপুকুরে তিনি কোন-কোন ধনীগৃহে গৃহদেবতার পূজার ভার পেলেন। এতে ক'রে অর্থোপায় তাঁর খুব বেশী না হ'ক, মনোমত কাজ পেয়ে আনন্দ হ'য়েছিল খুব, এবং

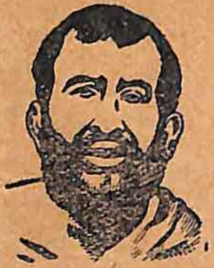


সাধনার পথে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার সুযোগও মিলেছিল অখণ্ড।

এ-থেকে কিন্তু এমন একটা অবস্থা ক্রমে এসে প'ড়ল, যা রামকুমারের পক্ষে মোটেই প্রীতিকর হ'ল না। গদাধর দিনরাত পূজা অর্চনা নিয়েই যেন কোন এক কল্পলোকে বসবাস করতে থাকলেন, মাটির পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই যেন নেই তাঁর। সংসারে আসক্তি নেই, পয়সা রোজগার করা যে একান্তই দরকার, এ জ্ঞানই নেই যেন তাঁর। বাস্তবিক অর্থকে এই বয়সেই গদাধর অনর্থের মূল ব'লে ভাবতে শিখেছিলেন। পরে এক সময়ে তিনি এক হাতে একটা টাকা, আর এক হাতে মাটির ঢেলা নিয়ে "টাকা মাটি, মাটি টাকা" ব'লতে-ব'লতে দু'টোই দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অর্থের অসারতা সম্বন্ধে তাঁর সেই দৃঢ় ধারণার উন্মেষ হ'য়েছিল এই সময়েই।

রামকুমার তাঁর এই সংসার-বিরক্তিকে মোটেই ভাল চো'খে দেখতে পারেন নি। পারবেন কি ক'রে? নিজের সামান্যই আয়, তাতে বৃহৎ সংসার পোষণ করা ত সোজা ব্যাপার নয়! তিনি নানাভাবে চেষ্টা ক'রতে লাগলেন—যাতে অর্থোপার্জ্জনের দিকে ছোট ভাইয়ের মনোযোগ আসে। কিন্তু কোন চেষ্টাতেই ফল হ'ল না।

এই সময়ে ঘটনাচক্রে রামকুমারের কিছু আর্থিক সুবিধে ঘ'টল, এবং গদাধরের সাধনার পথ প্রশস্ত হ'য়ে গেল। দু'টো



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

ব্যাপারই ঘ'টল একই সূত্র ধ'রে। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণির নাম অনেকেই জানেন। সেই সময়ে রাণী রাসমণির খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে প'ড়েছিল। কলিকাতা জানবাজারে এঁর বাস ছিল। প্রসিদ্ধ মাড়-বংশের ভূম্যধিকারিণী ছিলেন তিনি। ক'লকাতার ভিতরে এবং আশে-পাশে অনেক সম্পত্তি ছিল তাঁর। সহরের মাইল-পাঁচেক উত্তরে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে এঁদের বিস্তৃত বাগান ছিল। ঐ বাগানে তিনি বারোটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। আর প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন এক বিশাল কালীমন্দির। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী নামে এই মন্দির এখনো সারা ভারতের অন্যতম দর্শনীয় তীর্থরূপে বিরাজ ক'রছে। এরই পাশে নির্মিত হ'য়েছে গঙ্গার উপরে সুপ্রসিদ্ধ বালী-পুল।

রামকুমার ও গদাধর পূর্ব থেকেই রাণী রাসমণির পরিচিত ছিলেন। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ব'লে রামকুমারের উপর রাণীর শ্রদ্ধাও ছিল। তিনি রামকুমারকে এই কালীবাড়ীর পূজারী-পদে নিয়োগ করলেন। গদাধরও দাদার সহকারী হ'য়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

অতি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিতর অবস্থিত এই মহামন্দির। মন্দিরের পাদদেশেই প্রবাহিত পুণ্যসলিলা গঙ্গা, তার কল্লোল-ধ্বনি সদাই যেন অনন্তদেবের কাছে বিশ্বের মর্মবাণী নিবেদন ক'রছে—বিভিন্ন ছন্দে, বিচিত্র সঙ্গীতে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



সুশ্যাম তরুরাজি চারিদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ফুলের গন্ধে, পাখীরডাকে ঝলমল সূর্য্যকিরণে সে যেন এক স্বর্গরাজ্য। এ-যুগের বাস ও রেলগাড়ীর ঘর্ঘর-ঝঞ্ঝনা তখন অজ্ঞাত ছিল ও-অঞ্চলে, একটানা অনাবিল শান্তি অহোরাত্র বিরাজ ক'রত মন্দিরের আশে-পাশে। গদাধর প্রকৃতির এই রম্য তপোবনে এসে সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র পে'য়ে বেঁচে গেলেন।

কালীমাতার মূর্ত্তি—সে যেন এক চির-রহস্য, তার মাঝে নিহিত যেন অপার স্নেহ, অনাদি লীলা, অসীম মহাশক্তি। ভীমা ভয়ঙ্করীকে গদাধর দেখতে পেলেন পরমমঙ্গলময়ী মাতৃরূপে। নরমুণ্ডমালিনীকে তিনি দেখতে পেলেন বিশ্বপ্রসবিনীরূপে। কালীমাতার সম্মুখে ব'সে গদাধর যখন-তখন জ্ঞান হারিয়ে যান, চোখ দিয়ে তাঁর ঝরে আনন্দাশ্রু, সমাধিবিবশ দেহে ফোটে তাঁর আনন্দ-রোমাঞ্চ। লোকে দেখে অবাক হয়, কেউ-কেউ তাঁকে বলে পাগল, ভণ্ড ব'লতেও ছাড়ে না অনেকে। কিন্তু রাণী রাসমণি তাঁর ভাবোন্মাদ দশা দেখে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি ক'রলেন। তিনিই বুঝলেন যে, গদাধর সামান্য মানব নন, জন্মান্তরের সাধনার পুণ্যফল তাঁকে অতিদ্রুত মুক্তির পথে অগ্রসর ক'রে নিয়ে চ'লেছে।

এই সময়ে রামকুমারের মৃত্যু হ'ল, পূর্ব থেকেই গদাধর সহকারী পূজারী ছিলেন, এখন তিনি পূজারী পদে অভিষিক্ত হ'লেন। চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি মায়ের সমুখে ব'সে আছেন,



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

মায়ের সঙ্গেই কথা ও আলাপন, মায়ের কাছেই সুখদুঃখের নিবেদন, অন্যের অশ্রুত ভাষায় মা-ও প্রিয় ভক্তের সঙ্গে আলাপ করেন, সস্নেহে তাঁর সমস্ত সংশয় নিরসন ক'রে দেন। যেমন ক'রে সৃষ্টির আদি-কালে অপৌরুষেয় বেদ ফুটে উঠেছিল সত্যদর্শী ঋষিগণের মানসপটে, তেমনি ক'রে কালীমাতার প্রসাদে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানবিজ্ঞান ফুটে উঠতে লাগল অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পূজারীর চিত্ত-ফলকে, শাস্ত্রের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব, সৃষ্টির কোন গুপ্ত রহস্য অজানা বা অবোধ্য রইল না দক্ষিণেশ্বরবাসী এই দীন সাধকের।

ক্রমেই সংসার থেকে দূরে স'রে যা'চ্ছেন গদাধর। এটা তাঁর আত্মীয় বান্ধবদের বড়ই দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে উঠল। তাঁরা স্থির ক'রলেন, বৈরাগীকে সংসার বন্ধনে বেঁধে ফেলতে হবে বিবাহের নাগপাশে। তাঁরা চেষ্টা-চরিত্র ক'রে গদাধরের বিবাহ দিলেন। হুগলী জেলার জয়রামবাটী গ্রামে একটি সুলক্ষণা মেয়ে পাওয়া গেল—নাম তাঁর শ্রীশ্রীসারদামণি। তাঁর বয়স তখন মাত্র ছয় বৎসর। শুভদিনে এঁরই সঙ্গে গদাধরের শুভবিবাহ হ'য়ে গেল।

এ বিবাহ সত্য-সত্যই শুভ হ'য়েছিল। শ্রীশ্রীসারদা মাতা ভগবান রামকৃষ্ণের যোগ্যা সঙ্গিনী ছিলেন। উত্তরকালে তা পরিপূর্ণ ভাবে সপ্রমাণ হ'য়ে গিয়েছিল। তাঁর মত মনস্বিনী মহিলাকে সহধর্মিণী রূপে লাভ ক'রেছিলেন ব'লেই রামকৃষ্ণ-

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



দেবের সাধনা নির্বিঘ্ন হ'তে পেরেছিল। সংসারের ফাঁস তাঁর গলায় এঁটে বসতে পারেনি। বিবাহের সময় মাতাজী ত শিশুই ছিলেন, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়েও তিনি স্বামীকে প্রসন্ন-মনে অনুমতি দিয়েছিলেন—নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর দিয়ে সাধনার পথে অগ্রসর হ'য়ে যেতে। কৃতজ্ঞচিত্তে ঠাকুর নিজেও একথা অনেক সময়ে স্বীকার করতেন, ব'লতেন যে, শ্রীশ্রীসারদামণি অসাধারণ শক্তিমতী না হ'লে রামকৃষ্ণের সিদ্ধিলাভ সহজ হ'ত না। ভগবান বুদ্ধদেবের পত্নী যশোধরার সঙ্গে সারদামাতার এদিক দিয়ে বেশ তুলনা চলে। যশোধরার মতই সারদামণিও পরিণত বয়সে স্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছিলেন।

যা হ'ক, বিয়ের পরে গদাধর আবার তাঁর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে মায়ের চরণে জবার অঞ্জলি সমর্পণ ক'রতে ব'সলেন। বিবাহ-ব্যাপারটা তাঁর মনে সূক্ষ্মতম আঁচড়ও কা'টতে পারেনি। আত্মীয় বন্ধু যাঁরা গদাধরকে বিবাহের বাঁধনে শক্ত ক'রে বেঁধে ফেলবার আশা ক'রেছিলেন, তাঁরা সবিস্ময়ে ও সদুঃখে নিরীক্ষণ ক'রলেন যে, জলের উপরে তেলের মত গদাধর নিছক নিরাসক্ত ভাবে সংসারের উপরে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছেন।

সাধনা দ্রুত সিদ্ধির নিকটবর্ত্তী হ'য়ে এল। গদাধরের মনশ্চক্ষু সর্বদাই সম্মুখে এক জ্যোতির্লোক দেখতে পায় এখন। অন্তর সর্বদাই তাঁর স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। সেখানে



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

মাতাপুত্রের চলে বাৎসল্য-ভক্তির আদান-প্রদান, ক্রোধ-অভিমানের রৌদ্রছায়ার খেলা, প্রেমার্ণবের অনিবার বীচিভঙ্গ—কখনো উজ্জ্বল, কখনো-বা স্তিমিত!

পরিপূর্ণ ভাবোন্মাদ অবস্থা! পূজায় ব'সেছেন—সে পূজার আর শেষ নাই, আরতি সুরু ক'রেছেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ'লছেই সে আরতি! হবেই ত! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়ত যে পূজারতি চ'লেছে বিশ্বদেবীর, তার ত শেষ কোনদিনই হবে না! সাধক কোন্ প্রাণে তাঁর পূজারতিতে সমাপনের গণ্ডী এঁকে দেবেন?

কিন্তু এ-ভাবে নিত্যনৈমিত্তিক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া চ'লতে পারেনা ত! পূজায় পূজারীর আনন্দ বটে, কিন্তু সহকারীদের পক্ষে সেটা ত দৈনিক একটা কর্ত্তব্য বই কিছু নয়! তারা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। ক্রমে রাণী রাসমণির কানে কথাটা পৌঁছুলো। তিনি মন্দিরের নিত্য পূজার জন্য অন্য পূজারী নিযুক্ত ক'রলেন। রামকৃষ্ণ রইলেন মন্দিরের অন্যতর দেবতার মত, মা-কালীর প্রিয় পার্শ্বদের মত! তাঁর আদেশ মন্দিরের ভিতর অলঙ্ঘ্য, তাঁর মর্য্যাদা সেখানে মা-কালীর নীচেই!

এই সময় থেকে তাঁকে সবাই ডাকতে লাগল ঠাকুর রামকৃষ্ণ ব'লে, কেউ আবার ওটাকে সংক্ষেপ ক'রে নিয়ে শুধুই ঠাকুর নাম দিলে তাঁর। সারা ভারতবর্ষে ঠাকুর রামকৃষ্ণের খ্যাতি ছড়িয়ে প'ড়ল—সিদ্ধ পুরুষ ব'লে। বাঙালী-সমাজে ঠাকুর বলতে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



অনেকে তাঁকেই বুঝতে লাগল, ক'লকাতার শিষ্ট সমাজ তখন প্রায় ষোল আনাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের গুণমুগ্ধ, অনেকেই তাঁর ভক্ত, কেউ-কেউ অল্পবিস্তর তাঁর অন্তরঙ্গও বটেন। এঁদের ভিতরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি দিক্‌পাল মনস্বীদের নামও করা যেতে পারে। এঁরা এবং আরও অনেকে অবসর পেলেই ছুটে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে, এবং ঠাকুরের জ্ঞানগর্ভ আলাপন শুনে ধন্য হ'য়ে ফিরে আসতেন।

তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন নব্য-বাংলার পথপ্রদর্শক। তাঁর পরিচালনায় রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম নতুন তেজ সঞ্চয় ক'রে শিক্ষিত সমাজকে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছে। বেলঘরিয়ার এক বাগানে তিনি প্রায়ই যেতেন, সেখানে তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের সমাবেশ হ'ত। ধর্মালোচনা ও প্রার্থনায় কাল কাটা'তেন তাঁরা। একদা তাঁদের এই মজলিসে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই এসে উপনীত হ'লেন। কেশবচন্দ্র তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে এমনিই মুগ্ধ ও বিস্মিত হ'য়ে গেলেন যে, এর পর থেকে তিনি প্রায়ই ঠাকুরকে দর্শন ক'রবার জন্য ছুটে আসতেন এবং তাঁর কাছে ধর্মকথা শ্রবণ ক'রে পরম উপকৃত বোধ ক'রতেন!

১৮৮১ সালে যে-ঘটনাটি ঘটে, তা বাংলার জাতীয়-জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে ব'ললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

আমরা ব'লছি—রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের মিলনের কথা। বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্র নামে পরিচিত। সিমলার বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র তিনি। সবে তখন বি, এ পাশ ক'রেছেন তিনি। এক ভক্তের বাড়ীতে রামকৃষ্ণ তাঁকে প্রথম দেখেন এবং তাঁর গান শোনেন। তাঁর তেজোদীপ্ত সুন্দর মূর্ত্তি, তাঁর অপূর্ব সঙ্গীত, এবং সর্বোপরি তাঁর অদম্য তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসা, এ সবই মুগ্ধ ক'রল রামকৃষ্ণ দেবকে। ঠিক এমনটি তিনি আর কখনো দেখেন নি। দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ঠিক এমন একটি মানুষই তাঁর দরকার। কেন যে দরকার, তা তিনি বা নরেন্দ্র তখন কতদূর বুঝেছিলেন—জা'নবার উপায় নেই। কিন্তু এ যুগের মানুষ আমরা বুঝেছি—সেই মিলনের ফলে যে নব ভাবধারার উৎপত্তি হয়েছিল, তাই সঞ্জীবিত, প্রাণবন্ত ক'রেছে নবীন বাংলাকে, নবীন ভারতবর্ষকে। বাংলা তথা ভারতে নব প্রাণশক্তির আবির্ভাব হয়েছে কোন্ উৎস থেকে--এ প্রশ্ন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তবে তার উত্তরে নিঃসন্দেহে আমরা ব'লতে রাজী আছি যে, সে উৎসের অবস্থান সেই গোমুখীর মুখে, যেখানে রামকৃষ্ণের জ্ঞান এসে প্রেরণা দিয়েছিল বিবেকানন্দের কর্মকে।

রামকৃষ্ণের এই জ্ঞান সম্বন্ধে ব'লবার অনেক-কিছু আছে। তিনি সর্ব ধর্মকেই সমান সত্য ব'লে মা'নতেন। নৈষ্ঠিক-ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে, হিন্দুধর্মের অভেদ্য দুর্গ কালী-



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

মন্দিরের পূজারীর কার্য্য ক'রেও তিনি খৃষ্টান, মুসলমান সকল ধর্মকেই সত্য ব'লে উপলব্ধি ক'রতে পেরেছিলেন, এর মত পরমাশ্চর্য্য বস্তু আর কী আছে? তিনি শুধু মুখের কথায় সত্য ব'লে স্বীকার করেন নি সর্ব ধর্মকে, সকল ধর্ম মতেই তিনি কখনো-না-কখনো দীক্ষা নিয়েছিলেন, সকল ধর্মের পথেই তিনি সাধনা ক'রেছিলেন। তিনি মুসলমান হ'য়েও উপাসনা ক'রেছেন, তিনি খৃষ্টান হ'য়েও ভজনা ক'রেছেন। ফলে তিনি জেনেছেন—সকল ধর্মই এক ও সত্য। এই তত্ত্বই তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের মুখ থেকে নিঃসৃত হ'য়ে পরে এক সময়ে শিকাগো ধর্মমহামণ্ডলে সমবেত সর্বধর্মের মহান প্রতিনিধি মণ্ডলীকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ ক'রেছিল।

খৃষ্টান মুসলিম ধর্মের সাধনাই শুধু নয়, হিন্দুধর্মের ভিতরকার অগণ্য শাখা-ধর্মের প্রত্যেকটি অবলম্বন ক'রেই সাধনা করেছিলেন রামকৃষ্ণ। তিনি—যখন যে পথে সাধনা করতেন, তখন সর্বান্তঃকরণে নিজেকে সেই পথের পথিক ব'লে চিন্তা ক'রবার সামর্থ্য তাঁর ছিল। গোপী-ভাবে আরাধনা করার সময়ে তাঁর ভিতরে নারীসুলভ কমনীয়তা ও কোমলতার আবির্ভাব হ'য়েছিল, হনূমান ভাবে সাধনা ক'রবার সময়েও দেহের ও মনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসে-ছিল, এমন প্রবাদ আছে।

সকল ধর্মই এক, সবই সমান সত্য, সব ধর্মই ভগবানে



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পৌঁছুবার এক একটা ভিন্ন-ভিন্ন পথ—এ
তত্ত্ব ঘোষণা ক'রে বহুধর্মপীড়িত এই
ভারতবর্ষে একটা ঐক্যবোধ জাগ্রত
ক'রবার দিকে রামকৃষ্ণ যে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন, তার তুলনা হয় না। এ দেশে যখনই কোন সিদ্ধ-পুরুষ জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তখনই তিনি একটা শাখাধর্ম বা উপাসকমণ্ডলী সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন। রামানুজ, কবীর, শ্রীচৈতন্য, এবং তাঁদেরও পূর্বে বুদ্ধদেব, মহাবীর এবং নানক এই কার্য্য ক'রে গিয়েছেন। তাঁদের ধর্মমত যত উদার পবিত্রই হ'ক না কেন, তাঁদের প্রচারণার ফলে দেশের অনৈক্য দূর হওয়ার কোন কাজ হয়নি, উল্টে একটা নতুন ধর্ম বা সম্প্রদায় বেড়ে গিয়ে ধর্ম-গত বা সাম্প্রদায়িক অনৈক্য আরও খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বা তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের দ্বারা এই কার্য্যটি হয়নি। তাঁরা নতুন আলো দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু নতুন দল সৃষ্টি করেন নি। রামকৃষ্ণ-মিশনের কথা এই প্রসঙ্গে উঠতে পারে। কিন্তু—ও মিশন সেবকসঙ্ঘ মাত্র, ওটা কোন আলাদা সম্প্রদায় নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের ভিতর স্বামী বিবেকানন্দই অবশ্য পৃথিবীজোড়া কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন—নিজের অসাধারণ ত্যাগ ও শক্তির ফলে, কিন্তু তিনি ছাড়াও রামকৃষ্ণদেবের অনেক শক্তিমান শিষ্য ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ, তূরীয়ানন্দ প্রভৃতি শিষ্যেরা সাধনযোগে উচ্চস্থান ত অধিকার ক'রেই ছিলেন, তা ছাড়া



সংগঠন, জনসেবা ও দেশবিদেশে ধর্ম-প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁরা জনে-জনে প্রভূত শক্তির পরিচয়ও দিয়ে গিয়েছেন।

আজ রামকৃষ্ণ-মিশনের প্রচেষ্টায় সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরে যে কল্যাণকর ধর্মপ্রবাহ চ'লেছে, তার মূল প্রেরণা এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছ থেকে--এটা ভারতবাসী মাত্রকে স্মরণ ক'রতে হবে। দেবস্থান হিসাবে দক্ষিণেশ্বরের এবং মহাপুরুষরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের—খ্যাতি দিন-দিন যেমন বেড়ে উঠতে লাগল, সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব ভারতের সাধুসমাজ এই উভয়কে দর্শন ক'রবার জন্য উৎসুক হ'য়ে উঠতে লাগলেন। তারই জন্য দক্ষিণেশ্বরে ভারতের নানা প্রদেশ থেকে সমাগত সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড় বেড়েই যেতে লাগল ক্রমে-ক্রমে। তোতাপুরী নামে পশ্চিম দেশীয় একজন সিদ্ধ-পুরুষের আগমনে দক্ষিণেশ্বর পবিত্র হ'য়েছিল এই ভাবেই। তিনি দীর্ঘদিন এখানে অবস্থান ক'রেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান-প্রদানে উভয়েই প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হ'য়েছিলেন। রামকৃষ্ণ যে একজন সিদ্ধ-পুরুষ, সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি প্রায় বৎসর কাল ধ'রে রামকৃষ্ণ দেবকে বেদান্ত প'ড়ে শুনিয়েছিলেন। বেদান্ত এর পূর্ব্বে পড়েন নি রামকৃষ্ণ, কিন্তু বেদান্তের ভাবগাম্ভীর্য্য তাঁর অন্তরে আগে থেকেই আধিপত্য বিস্তার ক'রেছিল। তাই তোতাপুরীর আবৃত্তি শুনতে-শুনতে তিনি তন্ময় হ'য়ে



যেতেন, অপূর্ব্ব পুলকে তাঁর দু'নয়ন থেকে ঝরঝর অশ্রু ঝ'রত।

কলুটোলায় তখন এক বৈষ্ণব সম্মিলনী ছিল। সেখানে একদা রামকৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া হয়। কীর্ত্তন শুনতে-শুনতে তিনি মেতে উঠলেন। না'চতে না'চতে এক সময়ে ভাবাবেশে তিনি শ্রীচৈতন্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনেই ব'সে প'ড়লেন। ভক্তেরা একবাক্যে ব'লে উঠলেন, "মহাপ্রভুর আসনে ব'সবার যোগ্য পুরুষের দেখা পাওয়া গেল এতদিনে।"

আর একবার রঙ্গালয়ে "চৈতন্যলীলা" নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল ঠাকুরকে। অভিনয় দেখবার জন্য তাঁর আগ্রহ মোটেই ছিল না, তিনি গিয়েছেন চৈতন্যদেবের নামে আকৃষ্ট হ'য়ে। অভিনয় দেখতে-দেখতে তিনি কিন্তু স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হ'য়ে গেলেন একেবারে। তাঁর যেন মনে হ'ল চৈতন্যদেবের জীবননাট্য প্রকৃতই তাঁর সম্মুখে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চ'লেছে। শ্রীচৈতন্যের বিরহ বেদনা তিনি নিজের অন্তর দিয়েই অনুভব ক'রলেন, এবং অভিনয়ের পরে ফিরে আসবার সময় গাড়ীর ভিতর "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" ক'রে ক্রন্দন ক'রতে থাকলেন ক্রমাগত। তাঁর মুখে অবিরত ধ্বনিত হ'তে লাগল সেই অমৃত-বাণী— "আত্মা কৃষ্ণ, দেহ কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, প্রাণ কৃষ্ণ।" পূর্বেই বলা হ'য়েছে, কেশবচন্দ্র সেন প্রায়ই এসে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে



তত্ত্বকথা শ্রবণ ক'রে যেতেন। ব্রাহ্মধর্মের অন্য দিক্‌পালেরাও সবাই আসতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপ মজুমদারের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীরও আগমন হ'ত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও দু'একবার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল ঠাকুরের। কালনাতে একদা সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গোঁসাই ভগবানদাস বাবাজীর সঙ্গে মিলন হ'য়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। বাবাজী তাঁর ভাবোন্মাদ অবস্থা দেখে ব'লেছিলেন, "আপনিই চৈতন্যদেবের আসনের যোগ্য অধিকারী।"

একবার ঠাকুর কাশীধামে বেড়াতে যান। সেখানে দেখা হয় ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে। এই স্বামীজি সিদ্ধ পুরুষদের ভিতরও এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। মাদ্রাজে ছিল তাঁর বাড়ী। পূর্বাশ্রমে এঁর নাম ছিল শিবরাম। আ. চল্লিশ বৎসর বয়সে এঁর মাতার মৃত্যু হয়, তারপরই তিনি সংসার ত্যাগ করেন। যোগসাধনায় অসামান্য উন্নতি হয় তাঁর। অচিরেই তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়। তিনি দীর্ঘ দুইশত আশী বৎসর জীবিত ছিলেন। অনেক অলৌকিক বিভূতি তাঁর ছিল। রামকৃষ্ণ এঁর কাছে যোগসাধনার অনেক নিগূঢ় রহস্য অবগত হ'য়েছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ছিল তখন আনন্দের হাট। ঠাকুরকে ঘিরে যেন এক আধ্যাত্মিক মধুচক্র রচনা করেছিলেন ভক্তেরা। সেখানকার মধু যিনি একবার আস্বাদ ক'রতেন, তাঁকে বারবার



ঘুরে ফিরে দক্ষিণেশ্বরেই যেতে হ'ত। দিবারাত্র সেখানে চ'লত তত্ত্বকথা, সাধনা-পদ্ধতির আলোচনা, দেশবিদেশের নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ।

রামকৃষ্ণের সংসারের অনেকেই দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই আসতেন। মাতা চন্দ্রমণি ত আসতেনই। তাঁকে রামকৃষ্ণ কালীমাতার অংশস্বরূপাজ্ঞানে পূজা ক'রতেন। পত্নী শ্রীশ্রীসারদা দেবীও আসতেন মাঝে-মাঝে। শেষ দিকে তিনি রামকৃষ্ণের কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছিলেন, তা পূর্বেই ব'লেছি। ভাগিনেয় হৃদয়চন্দ্র এবং অন্য কয়েকজন আত্মীয় ত স্থায়ী ভাবেই দক্ষিণেশ্বরে বসবাস ক'রতেন। এঁদের প্রতিপালনের ভার রাণী রাসমণি এবং তাঁর জামাতা স্বনামধন্য মথুরবাবু সানন্দেই গ্রহণ ক'রেছিলেন। কিন্তু অর্থের উপর মর্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল ঠাকুরের, তা আমরা পূর্বেই ব'লেছি। এক হাতে মাটির ঢেলা এবং আর এক হাতে টাকা নিয়ে তিনি দু'টোয় যেন ওজন ক'রতেন ব'সে ব'সে। শেষকালে "টাকা মাটি, মাটি টাকা" ব'লতে ব'লতে দু,টোকেই ছুঁড়ে ফেলতেন দূরে। মথুরবাবু ঠাকুরকে বড়ই ভক্তি ক'রতেন। রাণী-রাসমণির সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তাঁরই উপর। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরও পরিচালনা ক'রতেন তিনিই। তাঁর ইচ্ছা হ'ল যে ঠাকুর ও তাঁর স্বজনবর্গের যাতে ভবিষ্যতে কোন কষ্ট না হ'তে পারে, এমন কোন ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। বিস্তীর্ণ



ভূসম্পত্তি ঠাকুরের নামে দানপত্র লিখে এনে মথুরবাবু ঠাকুরের হাতে দেওয়া মাত্র তিনি তা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে মায়ের মন্দিরে ছুটে গেলেন। মায়ের পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলেন এই ব'লে—"এরা আমায় সংসারী ক'রতে চায় মা, এদের হাত থেকে তুই আমায় রক্ষা কর্।" মথুরবাবু লজ্জিত হ'য়ে অধোবদনে প্রস্থান ক'রলেন। আর একবার তিনি একখানা মূল্যবান শাল এনে ঠাকুরের গায়ে পরিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর একটা শীতার্ত্ত কুকুর দেখতে পেয়ে তখনই তা ঐ কুকুরের গায়ে চড়িয়ে দিলেন। মথুরবাবু ত' অবাক! তিনি আর কখনো ঠাকুরকে কোন উপহার দিতে সাহস করেন নি। শোনা যায়, সমাধি অবস্থায় কেউ যদি ঠাকুরের গায়ে টাকা পয়সা ছুঁইয়ে দিত, তা'হ'লে তখনই দেহের সেই স্থানের চামড়া কুঁচকে ভিতরে ঢুকে যেত।

ঠাকুর বিলাসিতার লেশমাত্র সহ্য ক'র্তে পা'রতেন না। অথচ বেশভূষায় তিনি সন্ন্যাসীর মত কৌপীন ধারণ করেন নি কখনও। সাধারণ মোটা ধুতি পরাই তাঁর অভ্যাস ছিল।

ঠাকুরের ভক্তদের ভিতর বহু নারীও ছিলেন। ঠাকুর সর্বদাই তাঁদের প্রত্যেককে মাতৃজ্ঞানে সমাদর ক'রতেন। তাঁর চিত্তে বিকার ব'লে কোন বস্তু ছিল না।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

নির্জন সাধনার জন্য দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের উত্তরদিকে রামকৃষ্ণ পঞ্চবটী রোপণ করিয়েছিলেন। বট, অশ্বত্থ, নিম, আমলকী ও বেল—এই পাঁচরকম গাছ এক জায়গায় জন্মালে সে-স্থান সাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়। ভারতের বিভিন্ন পুণ্য স্থানে এইরকম পঞ্চবটীর অস্তিত্ব ছিল ও এখনও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের রোপিত পঞ্চবটী এখনও দক্ষিণেশ্বরে বর্ত্তমান র'য়েছে।

সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হ'য়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারা-ভারতের সাধু-সমাজের মাননীয় হ'য়ে উঠলেন এইভাবে। সবাই তাঁকে আহ্বান ক'রতে লাগল "পরমহংস দেব" নামে। ভক্তগণ কিন্তু তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে ডাকতেই ভালবাসেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের গলায় একটা ক্ষত হয়। ক্রমে এই ক্ষত এমন মারাত্মক হ'য়ে ওঠে যে, কিছুতেই কোন ডাক্তারই আর তা সারিয়ে দিতে পা'রলেন না। ক্রমে গলা ফেটে পূঁজরক্ত বেরুতে লা'গল। আহার এবং কথা বলা দুইই বন্ধ হ'য়ে গেল। সেদিনের সমস্ত খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে অগ্রসর হ'লেন তাঁর চিকিৎসার জন্য। কিন্তু কিছুতেই ফল হ'ল না। তিনি মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা ক'র্‌লেন। সেটা বাংলা ১২৯৩ সাল। ৩১শে শ্রাবণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর টোলচতুষ্পাঠীতে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা কিছুই



পান নি। সে হিসাবে তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ হওয়ারই কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর জ্ঞান যেন ছিল অসীম, অনন্ত। সেই প্রায়-নিরক্ষর ব্রাহ্মণ-পূজারী যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য পাণ্ডতদের কি ক'রে তত্ত্ব শিক্ষা দিতেন, আর কি ক'রে তাঁদের সমস্ত সংশয় ভঞ্জন ক'রে সর্বজ্ঞ ব'লে তাঁদের পূজা লাভ করতেন, এ এক পরম রহস্য। জটিল আধ্যাত্মিক তথ্যসমূহ তিনি সকলের সহজবোধ্য কথায় গল্পচ্ছলে এমনভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে, কারও আর তা না বুঝে উপায় ছিল না। যীশু খৃষ্টের গল্পের সঙ্গে এগুলি তুলনা করা যেতে পারে। আমরা এর ভিতর কতকগুলি বেছে-বেছে এখানে উদ্ধৃত ক'রছি। বাকী সব বড় হ'য়ে তোমরা প'ড়তে পা'রবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও দর্শন সম্বন্ধে বড়-বড় পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হ'য়েছে।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী।

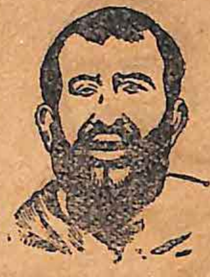
(ক) অবতার।

১। নদীর জলে ছোট পাতলা কাঠের টুকরোও ভেসে যায়, আবার বড়-বড় বাহাদুরী শালও ভেসে যায়। তফাৎ কি? তফাৎ এই যে, পাতলা কাঠের উপর ছোট পাখীটাও ব'সতে পারে না। কাঠ তখুনি ডুবে যাবে, কিন্তু বাহাদুরী কাঠের উপর পঞ্চাশটা মানুষ এক সাথে ব'সে গেলেও তা ডুববে না। স্বচ্ছন্দে পিঠে ক'রে মানুষ গুলোকে নিয়ে যাবে তাদের গন্তব্য স্থানে। ঐ বাহাদুরী-কাঠের মত মানুষ যখন জন্মায়, তখন তাদের বলা হয় অবতার। তাঁরা হাজার-হাজার লোককে হাতে ধ'রে ধর্মপথে পরিচালন করেন। সাধারণ ধার্মিকেরা ঐ ছোট হালকা কাঠের জাতীয়, কষ্টে কোন-রকমে নিজের পথে চলে—সংসার-সমুদ্রের ঢেউয়ে হাবুডুবু খেতে-খেতে। অন্য কাউকে টেনে নিয়ে যাবার শক্তি মোটেই নেই।

২। অবতারেরা যেন রেলের ইঞ্জিন। তাঁদের কাজই হ'ল যাত্রী-বোঝাই গাড়ী আর মালগাড়ী টেনে নিয়ে যাওয়া। সাধারণ লোক মাল বা মানুষ-বওয়া গাড়ী, নিজের শক্তিতে এক পা-ও এগিয়ে যাবার শক্তি নেই।

(খ) আত্মজ্ঞান।

১। "আমি" কি? দেহের কোন্‌খানে "আমি"



বস্তুটির অবস্থান? প্যাঁজের সবই খোসা। খোসা ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে ভিতরে যদি প্যাঁজের সন্ধান করা যায়, শেষকালে দেখা যাবে 'ভিতর' ব'লে কোন বস্তু নেই। তেমনি মানুষেরও দেহে "ভিতর" ব'লে কিছু নেই, সবই খোসা। কিন্তু "ভিতর" আছে দেহের অতীত একটা বস্তু। সেটাই হ'ল আত্মা বা চৈতন্য। সেই চৈতন্যেরও অন্তরালে ভগবানের আসন।

২। কাঁচা "আমি" আর পাকা "আমি" এই দুই-রকমের "আমি" আছে। আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমি লাট, আমি বড়—এইসব হ'ল কাঁচা "আমি"র অভিব্যক্তি। পাকা "আমি'র অভিব্যক্তি হ'ল এইরকম—আমি ভগবানের সন্তান, আমি ভগবানের রূপান্তর, আমি নিত্য মুক্ত পুরুষ, ইত্যাদি।

৩। এক কথায় জ্ঞান লাভ হয়, এমন কথা কি আছে? "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"—এইটিই হ'ল সেই কথা।

৪। "আমিত্ব" একেবারে যায় না। নারিকেলের পাতা প'ড়ে গেলেও তার দাগ থাকে গাছের দেহে। তেমনি আমিত্ব-বোধ দূর হ'য়ে গেলেও মানুষের মনে একটুখানি দাগ তার থেকেই যায়। কিন্তু তাতে মুক্ত-পুরুষের ক্ষতি কিছু হয় না।

৫। শ্রীরামকৃষ্ণ একদা তোতাপুরীকে প্রশ্ন ক'রেছিলেন—



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

"তুমিত মুক্ত-পুরুষ, তোমার আবার রোজ-রোজ ধ্যান করা কেন ?" তোতা-পুরী উত্তর ক'র্‌লেন "চিত্তশুদ্ধির জন্য ! ঘটি রোজ না মা'জলে ময়লা ধরে"। ঠাকুর ব'ললেন—"হাঁ, যদি-না সেটা সোনার ঘটি হয়"। অর্থাৎ পূরোপূরী মুক্তি যার ঘটেনি, তারই থাকে ময়লা-জমার ভয়।

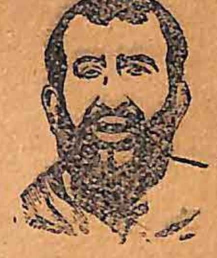
৬। যার 'আলো' ব'লে জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার ব'লেও জ্ঞান থাকবে। পাপ-জ্ঞান থাকলে পুণ্য-জ্ঞান, ভাল-জ্ঞান থাকলে মন্দ-জ্ঞান—এইরকম সব পরস্পর জড়িত। তেমনি আমিত্ব-বোধও তুমিত্ব-বোধ।

৭। কাঁটার উপর দিয়ে কে চ'লতে পারে ? যার পায়ে জুতো আছে। সংসারে স্বচ্ছন্দে বিচরণ ক'রতে পারে কে ? যার অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানের আবরণ আছে।

৮। এক সাধু কুকুরের উপর ব'সে ভিক্ষান্ন খাচ্ছেন এবং কুকুরকেও খাওয়াচ্ছেন। লোকে তাঁকে দেখে পাগল মনে ক'রে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। সাধু তাদের জ্ঞান দেবার জন্য ব'ললেন—

"বিষ্ণূপরি স্থিতো বিষ্ণু,
বিষ্ণু খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসসি রে বিষ্ণো,
সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥"

বিষ্ণুর (কুকুরের) উপর বিষ্ণু (মানুষ) ব'সে বিষ্ণুকে



(কুকুরকে) বিষ্ণু (ভাত) খাওয়াচ্ছে। ওহে বিষ্ণু (সাধারণ লোক)! তোমরা হা'সছ কেন? সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময়। ঘৃণা ক'রব কাকে?

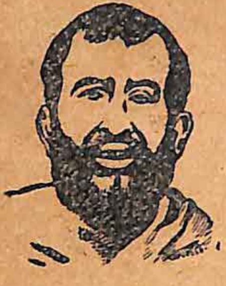
(গ) আহার।

১। সাত্ত্বিক আহার খেলেই মন সত্ত্বগুণে পূর্ণ হ'য়ে উঠে না। রোজ হবিষ্যান্ন খা'চ্ছে অথচ ঈশ্বরে মন নেই, এমন লোকও আছে। তার হবিষ্যান্ন গোমাংসের তুল্য। আবার এমন লোকও আছে, যে গোমাংস ভোজন ক'রেও ঈশ্বরপরায়ণ। তার গোমাংসই হবিষ্যান্নের কাজ করবে।

২। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শাশুড়ী একদিন পরমহংস দেবের কাছে আক্ষেপ ক'রেছিলেন যে, এখনো তাঁর মনের বিকার গেল না। কারও এঁটো খেতে তাঁর প্রবৃত্তি হয় না। ঠাকুর হেসে ব'ললেন—"তাতে কি? এঁটো খেতে রুচি হ'লেই কি সে মুক্ত হ'য়ে যাবে না কি? তাহ'লে ত, শেয়াল কুকুরেরা সবাই মুক্ত-পুরুষ। তাদের ত, কারও এঁটো খেতেই আপত্তি নেই।

(ঘ) ঈশ্বর।

১। ভগবান সকলের উপরই আছেন। তিনি সকলের সবই দেখেন। কিন্তু তাঁকে কেউই দেখতে পায় না। ঠিক যেন বড়ঘরের মেয়েরা চিকের আড়ালে ব'সে যাত্রা দেখছে। আসরের কেউ তাদের দেখতে পা'চ্ছে না, কিন্তু



তারা আড়াল থেকে না দেখছে এমন জিনিষ নেই।

২। কালী-নাম ক'রে সাধু সাধনায় বসেন, আবার কালী-নাম ক'রেই ডাকাত ডাকাতি ক'রতে বেরোয়। ডাকাত যদি কালীনামের অপব্যবহার করে, তাতে নামের দোষ হ'তে পারে না। একই আলোতে ব'সে কেউ শাস্ত্র পাঠ ক'রছে, কেউ ভাত রাঁধছে, কেউ সিঁদকাঠি গ'ড়ছে। আলোর অপরাধ কি?

৩। ব্রহ্ম আর শক্তি অভিন্ন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ভিতর তাঁর শক্তির বিকাশ। শক্তি যখন স্ফূর্ত্তি পায় না, তখন ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় বা শুদ্ধ ব্রহ্ম।

৪। একদিন মথুরবাবু ঠাকুরের কথায় একটু অবিশ্বাস ক'রেছিলেন। ঠাকুর ব'লেছিলেন—ঈশ্বরের ইচ্ছায় সবই হ'তে পারে।" মথুরবাবু তর্ক তু'ললেন—"ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিন্তু লাল জবার গাছে সাদা জবাফুল ফুটতে পারে না।" এর কয়েকদিন পরেই কালীমন্দিরের ফুলবাগানে লাল জবার গাছে এক সাদা জবার ফুল ফুটে ব'সল। মথুরবাবু দেখে অবাক! তিনি তারপর আর কোনদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তর্ক করেন নি।

৫। পরমহংসদেব কাশীভ্রমণে গিয়ে একবার ত্রৈলঙ্গ-স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ঈশ্বর এক—এ-বিষয়ে যখন সন্দেহ নেই, তখন এত লোকে বহু ঈশ্বর কল্পনা করে



কেন? স্বামীজি ব'লেছিলেন—তর্ক করতে গেলেই বহুবুদ্ধি, ধ্যানস্থ হ'লেই দেখা যায় এক ঈশ্বর।

৬। কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় শয়ন ক'রে মহাত্মা ভীষ্ম অশ্রুমোচন ক'রেছিলেন। তা দেখে কেউ-কেউ তাঁকে প্রশ্ন ক'রেছিল—"আপনার মত মহাপুরুষ কেন দেহত্যাগের আশঙ্কায় কাতর হ'চ্ছেন?" ভীষ্ম ব'ললেন, "দেহত্যাগের আশঙ্কায় কাতর হই নি! ভগবানের লীলা যে কিছুই বু'ঝতে পারলাম না, এইটেই আমার দুঃখের হেতু! বিপত্তিকালে মধুসূদনের নাম জপ ক'রলেই বিপত্তি খণ্ডন হয়, কিন্তু সেই মধুসূদন স্বয়ং পাণ্ডব-রথে সারথি থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের বিপত্তির অবধি নেই।"

৭। ঈশ্বর যেন অনন্ত জলধি। ভক্তের ভক্তির শৈত্য সেই জলধির জলকে জায়গায়-জায়গায় জমিয়ে বরফ ক'রে তোলে। সেই বরফকেই আমরা বলি সাকার ব্রহ্ম। আবার যখন সাধকের মনে জ্ঞানের সূর্য্য উদিত হয়, তখন বরফ গ'লে জল আবার জলে মিশে যায়। তখন ব্রহ্ম যে নিরাকার, সেই নিরাকার।

৮। যাদৃশী ভাবনা, তাদৃশী সিদ্ধি। মানুষ নিজে থেকে যেমনটা ভাবে, ভগবানও যেন ঠিক তাতেই সায় দেন। গরীবের ছেলে বড়লোক হ'লে ভাবে সে বেশ আছে। তখন তার বিবেকও এমন কথা বলে না যে, সে বেশ নেই।



সেই লোকই আবার পরিণত বয়সে চিন্তা করে—জীবনটা বৃথায় গেল। আসল কাজ কিছুই করা হয় নি। ভগবান তখন তাকে যেন চো'খে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, সত্যিই সে জীবনটাকে অপব্যয় ক'রেছে, আসল কাজ সে কিছুই করে নি।

(ঙ) কর্মফল

১। দু'টো জিনিষ কেউ হজম করতে পারে না—পাপ আর পারা। পারা খাও, একদিন না-একদিন তোমার গায়ে ফুটে বেরোবে। পাপ কর, একদিন-না-একদিন তার জন্য তোমায় সাজা পেতে হবে।

২। গুটীপোকা আপনারই নালে ঘর তৈরী ক'রে তাতেই আ'টকে পড়ে। সে-ঘর কেটে বেরোবার শক্তি পায় প্রজাপতি হবার পরে। তেমনি সংসারী লোক নিজেরই কর্মের জালে জড়িয়ে পড়ে। বৈরাগ্য না জন্মানো পর্য্যন্ত সে-জাল কেটে বেরোতে সক্ষম হয় না।

(চ) গুরু

১। গুরু অবশ্য একজনই থা'কবে, কিন্তু গুরু-ছাড়া অন্যের কাছেও শিক্ষা নিতে দোষ নেই। যার ভিতরে যেটা ভাল দেখবে, সেইটে অনুকরণ ক'রবে তখনই। সেই গুণটুকু নিজস্ব ক'রে নেবার চেষ্টা ক'রবে। ইতর-জীবের কাছেও এ-রকম শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তবে

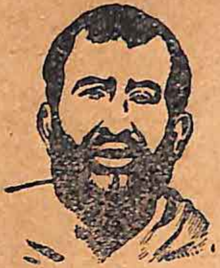
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ছাড়া এরকম শিক্ষালাভের সুযোগ কেউ পায় না।

২। এক ব্যাধ জঙ্গলের পাশে দাঁড়িয়ে গাছে একটা পাখীকে লক্ষ্য ক'রছে। আর কোনদিকে তার মন নেই। এমন সময়ে পাশের রাস্তা দিয়ে অনেক বাদ্য বাজিয়ে বরযাত্রীর দল যায়। মহা হৈ-চৈ, ব্যাধ কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করলে না একবারটিও। একমনে তাকিয়ে রইল নিজের লক্ষ্যের পানে। এই ব্যাধের একাগ্রতা অনুকরণীয়, যে গুণগ্রাহী হবে, সে এর কাছে একাগ্রতা শিক্ষা ক'রবে। এমনি তন্ময়তা ছাড়া ভগবৎ-চিন্তায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়।

৩। ভদ্রলোক ছিপ ফেলে ব'সে আছেন। ছিপে মাছ খাচ্ছে। তাঁর লক্ষ্য ফাৎনার দিকে। পিছন থেকে আর একটি ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস ক'রলেন— "দাদা! ধূলগাঁয়ে যাব কোন্ পথে?" কোন উত্তর নেই। বারবার প্রশ্ন হ'ল, মৎস্য-শিকারী শুনতেও পা'চ্ছেন সব, কিন্তু উত্তর দিচ্ছেন না। অবশেষে মাছ বিঁধল, মাছ টেনে ডাঙ্গায় তুলে তবে শিকারী অন্য ভদ্রলোকটির পানে ফিরে চাইলেন— ব'ললেন "ধূলগাঁ? ওই উত্তরদিকের রাস্তা।" এই মৎস্যশিকারীর ব্যবহার থেকে শিক্ষা নিতে হবে—কি ক'রে কার্য্য সিদ্ধি ক'রতে পারা যায়। যতক্ষণ কাজ হাঁসিল না হচ্ছে, ততক্ষণ কোনদিকে দৃষ্টি দেবে না পলকের তরে।



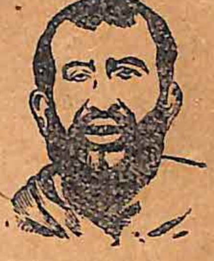
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

৪। একটা চিল মাছ ধ'রেছে। মাছ মুখে ক'রে সে যেই আকাশে উঠল, অমনি একপাল চিল আর কাক তাকে ক'রলে তাড়া। চ্যাঁ-চ্যাঁর অন্ত নেই। তাকে ঠুক্‌রে কাম'ড়ে, পালক ছিঁড়ে, অতিষ্ঠ ক'রে তুললে সবাই। অবশেষে সে ঠোঁট থেকে মাছটা ফেলে দিয়ে রেহাই পেলে। মাছ যেমনি প'ড়ল, অমনি অন্য এক চিল এসে ছোঁ মেরে ধ'রল সেটা। আর তক্ষুণি সেই চিলের পাল আর কাকের ঝাঁক আগের চিলটাকে ছেড়ে দিয়ে এই নতুন মৎস্যশিকারীকে ধ'রল ছেঁকে। আগের চিলটি পরম নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিরাপদে ব'সে রইল।

এতে ক'রে এই শিক্ষা পেতে পারা যায় যে, ঐশ্বর্য্যই বিপদের মূল, অর্থই অনর্থ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ওকে বিসর্জন দিয়ে নিজের নিরাপত্তা বিধান ক'রতে একটুও দ্বিধা করেন না।

৫। বক একটা মাছ লক্ষ্য ক'রে ধীরে-ধীরে অতি সাবধানে তাকে ধ'রতে যাচ্ছে। পিছনে যে শিকারী এসে ঐ বককেই শীকার করতে উদ্যত হ'য়েছে, সে দিকে লক্ষ্যই নেই তার। ঐ বকের একাগ্রতাও অনুকরণীয়।

৬। মৌমাছি অনেক কষ্টে মধু সঞ্চয় ক'রছে মৌচাকে। অবশেষে একদিন মানুষ এসে তার চাক ভেঙে মধু নিয়ে চ'লে গেল। মৌমাছিও মারা প'ড়ল সেই সময়ে। এ-থেকেও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি শিক্ষা পেতে পারেন। সঞ্চয় করা



মূর্খতা। কারণ, সঞ্চিত বস্তু ত' তোমার ভোগে লা'গবেই-না, উপরন্তু ঐ জিনিষের লোভে আততায়ীরা এসে তোমার মৃত্যুও ঘটা'তে পারে।

৭। উপদেশ দেওয়ার প্রবৃত্তি সবারই আছে, উপদেশ গ্রহণ ক'রে তা মেনে চ'লবার প্রবৃত্তি থাকে কম লোকের। এইজন্মই কথা আছে—"গুরু মিলে লাখ্ লাখ্, চেলা না-মিলে এক।"

৮। যার সত্যই সাধন-ভজনের প্রতি ঝোঁক আছে, তার গুরু আপনা থেকেই জুটে যায়। ভগবান ঠিক সময়মত জুটিয়ে দেন সদ্গুরু। প্রয়োজন হ'ল নিজের মনকে তৈরী করা। ক্ষেতে পাট না হ'লে গুরু এসে ফসল বুনে ক'রবে কি?

৯। তিনরকম গুরু আছেন। একজাতীয় গুরু উপদেশ দিয়েই খালাস। শিষ্য তা বুঝল কিনা, বা বুঝে তদনুযায়ী কাজ ক'রছে কিনা, সে খোঁজ নেওয়ার আবশ্যক মনে করেন না তিনি। এ-জাতীয় গুরুকে অধম গুরু বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরু বারবার খোঁজ নেন, বারবার উপদেশ দেন, শিষ্যকে সৎপথে চালিত ক'রবার জন্য আগ্রহ দেখান। এঁরা মধ্যম গুরু। আর একরকম গুরু আছেন—তাঁরা নাছোড়বান্দা। যেরূপে হ'ক শিষ্যকে তরাবেনই, শিষ্যের রেহাই নেই তাঁদের হাত থেকে। অমনোযোগী শিষ্যকে তাঁরা একাগ্র ক'রে তোলেন, বিষয়ে



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

বদ্ধ যে শিষ্য, তাকে ক'রে তোলেন বিবেকী ও বৈরাগী, ভগবৎবিমুখ শিষ্যকে ক'রে তোলেন ভগবৎপরায়ণ। এঁদেরই বলতে হবে উত্তম গুরু। বলা বাহুল্য, দেশে অধম গুরুরই ছড়াছড়ি।

(ছ) জীবের বিভিন্ন দশা।

১। সব মানুষই অন্তরে একরকম, পার্থক্য যা কিছু,—তা বাইরে। ঠিক যেন বালিশ। ভিতরে সবারই সেই একই তুলো। কিন্তু বাইরের খোল কারো-বা লাল, কারো-বা কালো, কারো-বা একরঙা, কারো-বা ডোরা-কাটা। মানুষ সাধু বা অসাধু, কালো বা ফর্সা, ধনী বা দরিদ্র—যা-ই হ'ক না কেন, সকলেরই অন্তরে সেই একই ঈশ্বর বিরাজ ক'র্ছেন।

২। কুলো আর চালুনী—সব সংসারেই আছে। কুলো কি কাজ করে? ঝেড়ে বাজে জিনিষ বাদ দেয়, সার জিনিষটি ধ'রে রাখে। আর চালুনীর কী কাজ? সে ছেঁকে সার বস্তুটি বাইরে ফেলে দেয়, অসারটুকুই ধ'রে রাখে। মানুষও অমনি দুইরকম আছে। কুলোধর্মী-মানুষ ঈশ্বরকে বজায় রেখে বিষয়কে দূরে ঝেড়ে ফেলে। আর চালুনী-ধর্মীরা বিষয়কেই আঁকড়ে থাকে, তাদের মনের সহস্র ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর যে কোন্ পথে গ'লে বেরিয়ে দূরে চ'লে যান, তা তারা জা'নতেও পারে না, জা'নতে চায়ও না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



৩। গুব্‌রে পোকা দেখেছ? গুব্‌রে পোকা? তারা গোবরের ভিতর থাকে ভাল। গোবর থেকে বা'র ক'রে এনে ফুলের উপর বসিয়ে দাও তাদের, তারা শুকিয়ে ম'রে যাবে। তেমনি হ'ল বিষয়ী লোক। বিষয়ের পাঁকের ভিতরই তারা মজায় থাকে। বিষয় থেকে তাদের মন টেনে এনে ঈশ্বরে নিবিষ্ট ক'রতে যাও, দেখবে তারা রীতিমত কষ্ট পা'চ্ছে।

৪। জালে মাছ-ধরা দেখেছ? জালে প'ড়লে কতক মাছ লাফালাফি করে বেরুবার জন্য, কতক চুপ্‌ ক'রে প'ড়ে থাকে মরার মত। কতকগুলি-বা জাল ছিঁড়ে বেরিয়েই পড়ে। মানুষও এমনি। কতক মানুষ সংসার-মায়া কাটিয়ে বেরুবার জন্য চেষ্টা করে, কতক-বা সেই মায়ার খপ্পরেই বেশ অলস হ'য়ে প'ড়ে ঘুমোয়। কোন-কোন মানুষ আবার মায়ার জাল কাটিয়ে সংসার থেকে বেরিয়েও পড়ে। মুমুক্ষু, বদ্ধ আর মুক্ত —এই তিন শ্রেণীর মানুষ এরা।

৫। এক মেছুনিকে নিয়ে মজার ব্যাপার ঘ'টেছিল। একদিন হাট থেকে ফিরতে তার রাত্রি হ'য়ে গেল। পথে উঠল ঝড়, বৃষ্টিতে পৃথিবী ভেসে যেতে লাগল। সে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিল পথের ধারের এক ফুল-বাগানে। মালী তাকে নিজের ঘরের দাওয়ায় আশ্রয় দিল, রাত্রি বেশী হয়ে গেল। ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে, অত রাত্রে আর বাড়ী যাওয়া



সম্ভব নয় দেখে মেছুনী দাওয়াতেই শুয়ে প'ড়ল। চারিদিকে ফুলের গন্ধ, মেছুনীর আর কিছুতেই ঘুম হয় না। অবশেষে আঁ'স্ চুপড়ীটা এনে মাথার কাছে রেখে দিল সে। মাছের গন্ধে এইবার তার দিব্য ঘুম হ'ল।

অমনি বিষয়ী লোক পঙ্কিল বিষয় ব্যাপারেই শান্তি পায়। ঈশ্বর-কথা উঠলেই অস্থির হ'য়ে পড়ে।

৬। পায়রার ছানার গলায় হাত দাও, সে গজগজ শব্দ ক'রবে। বিষয়ী লোক সম্বন্ধেও ঐ কথা। তাদের সঙ্গে কথা কও, অমনি দেখবে বিষয় বাসনা তাদের ভিতর গজগজ ক'রে সাড়া দিচ্ছে।

৭। মূলো খেলে ঢেঁকুর উঠবেই। যে ধার্মিক, সে সব কথাতেই ধর্মের প্রসঙ্গ এনে ফেলে। তেমনি বিষয়ীরা সব কথাতেই এনে ফেলে বিষয়-প্রসঙ্গ।

৮। মাছি দুইরকম। একরকম আছে, তারা মধু ভিন্ন কিছু খায় না, যেখানে মধু নেই, সেখানে বসে না তিলেকের জন্যও। আর একরকম আছে, তারা মধু খায় বটে, কিন্তু পচা-ঘা'য়ের রস পেলে মধু ছেড়ে তাতেই মজগুল হ'য়ে যায়। মানুষও দুইরকম। একজাতীয় মানুষ ঈশ্বরে ভিন্ন মজা পায় না। আর একজাতীয় মানুষ কালে-ভদ্রে ঈশ্বর-কথা শোনে বটে, কিন্তু বিষয়-প্রসঙ্গ উঠলে পরে তাতেই আনন্দ পায় বেশী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



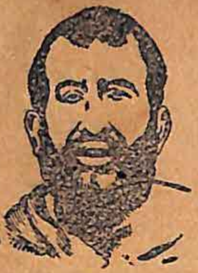
৯। বদ্ধ-জীব কারা? যারা ধর্মকথা নিজেরাও কয় না, অন্যকেও বলতে দেয় না, যারা বলে—তাদেরও বিদ্রূপ করে। বদ্ধ জীবকে ধর্মের কথা শোনাতে যাও, দেখবে যে, ধর্ম-কথা তার কাণ থেকে পিছলে পড়ছে, যেমন কুমীরের গা থেকে কুড়োল ঠিক্‌রে পড়ে।

১০। সূর্য্যের কিরণ সব জায়গাতেই পড়ে, কিন্তু তা বেশী উজ্জ্বল দেখায় কখন? যখন তা জল বা কাঁচ বা অমনি কোন স্বচ্ছ বস্তুর উপর পড়ে। ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন বটে, কিন্তু তাঁর সমধিক প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, সাধু ব্যক্তির অন্তরে।

১১। জল সর্বত্রই নারায়ণ। কিন্তু তাই ব'লে কি সকল জলই পান করা যায়? কোন জল খাওয়া চলে, কোন জলে আবার পা-ধোয়া পর্য্যন্ত চলতে পারে না। তেমনি ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন বটে, কিন্তু তাই ব'লে কি সর্বত্র যাওয়া চলে? মোটেই না! এমন সব খারাপ জায়গা আছে, যেখানে যাওয়া অন্যায়।

ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজ করেন, তাই ব'লে কি বাঘকে আলিঙ্গন করতে যেতে হবে? কু-লোকের ভিতরও ঈশ্বর আছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু কু-লোকের সঙ্গ করা অনুচিত।

পাগলা হাতী ছুটে আসছে, পিঠে ব'সে মাহুত চেঁচিয়ে



বলছে—"পালাও, সবাই পালাও !" সাধু একজন হাতীর সমুখে পড়েছিলেন, তিনি ভাবলেন, পালাব কেন ? ওই পাগলা হাতীর ভিতরও ত' নারায়ণ আছেন ! নারায়ণ থেকে ভয় কি ? সাধু পালালেন না। হাতী ছুটে এসে তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেললে। পিতৃপুণ্যে তিনি বেঁচে গেলেন। গুরুকে গিয়ে সব কথা নিবেদন করতেই তিনি বললেন—"স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করতে হবে বই কি ! হাতী-নারায়ণকে ভয় না কর, মাহুত-নারায়ণের উপদেশ তুমি শুনলে না কেন ? মাহুত-নারায়ণ ত' তোমায় সরে যেতে বলছিলেন।"

১২। সৎলোকের রাগ হ'ল ঠিক যেন জলের দাগ। দেখা দিয়ে তখনই মিলিয়ে যায়।

১৩। ব্রাহ্মণ অনেক আছে—কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়, কেউ সাধু হয়, কেউ-বা আবার ভাত রাঁধে।

১৪। ভগবান যেন কষ্টিপাথর। কে সাধু, কে কপট, তা তাঁরই কাছে পরীক্ষা হয়।

১৫। মানুষ সবাই, তার ভিতর যাঁরা ঈশ্বর-পরায়ণ, তাঁরা মান্-হুঁষ ! সংসারীলোকের হুঁষ কিছুতেই হয় না।

১৬। উট কাঁটা-ঘাস খেতে বড় ভালবাসে। কাঁটা চিবোতে গিয়ে মুখ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে দরদর ধারে রক্ত পড়ছে, তবু সেই কাঁটা-ঘাস ছাড়া অন্য কিছু সে খাবে না। সংসারী লোক শোকে-তাপে জর্জ্জর হবে, তবু সে সংসার ছাড়বে না।



১৭। কোন্ কোন্ লোকের কাছে সাবধান থাকতে হবে?

মুখ হল্‌সা, ভেতর বুঁদে, কান তুল্‌সে
দীঘল ঘোমটা নারী,
পানাপুকুরের ঠাণ্ডা জল
বড়ই মন্দকারী।
ভণ্ড লোক থেকে সবাই সাবধান!

(জ) ধ্যান।

১। ধ্যান করবে গোপনে। প্রকৃত সাত্ত্বিক লোকে রাত্রে মশারির ভিতর ব'সে ধ্যানস্থ হন। লোক দেখিয়ে যারা ধ্যান করে, তারা করে ভণ্ডামি।

২। প্রকৃত সাধকেরা ধ্যান করতে ব'সে কখনো-কখনো তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েন। এই তন্দ্রাকে বলে, যোগ-নিদ্রা। যোগনিদ্রাবশে ভগবদ্দর্শন হয় কোন-কোন সাধুর।

৩। ধ্যান মানেই তন্ময়তা। পাখী গায়ে-মাথায় ব'সে খেলা করবে, তবু ধ্যানস্থ সাধক তা টের পাবে না—এই হ'ল প্রকৃত ধ্যান। ধ্যানস্থ রত্নাকরকে ঢেকে উই-ঢিপি গজিয়ে উঠেছিল, তবু তিনি টের পাননি। তাই রত্নাকরের নাম, বাল্মীকি। বল্মীক মানেই ত' উইঢিপি।

পরমহংসদেব যখন ধ্যানস্থ হ'তেন দক্ষিণেশ্বরের



নাটমন্দিরে ব'সে, তখনও না কি শালিক আর চড়াই পাখীরা তাঁর গায়ে ব'সে খেলা করত।

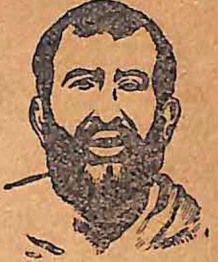
৪। প্রথম অবস্থায় ধ্যানের জন্য নির্জন স্থান আবশ্যক। ক্রমে যখন চিত্ত বশীভূত হ'য়ে আসবে, তখন যেখানে-সেখানে ধ্যান করা যেতে পারবে। কচি চারাগাছ বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে, তা নইলে ছাগলে গরুতে খেয়ে যাবে, কিন্তু ওই চারাই যখন বড় গাছ হ'য়ে উঠবে, তখন দশ-বিশটা গরু-ছাগল ওতে স্বচ্ছন্দে বেঁধে রাখা যেতে পারে।

৫। কাঁচা মন হ'ল, দুধ। দুধ যেমন জলের ভিতর পড়লে তার আর স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে না, তেমনি কাঁচা সাধক সংসারের ভিতর নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে না। দুধ থেকে মাখন তুললে কিন্তু সে মাখন জলের ভিতরও আলাদা হ'য়ে থাকে। পাকা সাধকের মন হ'চ্ছে ঠিক যেন মাখন। ও কিছুতেই সংসারে বসে না।

৬। নিষ্ঠার দরকার সব-চেয়ে বেশী। নিষ্ঠা বিনা ইষ্টলাভ হয় না।

৭। রোগীর ঘরে তেঁতুলের আচার রাখলে তার রোগ সারা কঠিন। সংসারী মাত্রেই রোগী। কামিনী-কাঞ্চন হ'ল, তেঁতুলের আচারের চেয়েও সাংঘাতিক জিনিষ। ওতে বেষ্টিত হ'য়ে যে থাকবে, বিষয়-বাসনা রূপ রোগ তার সারবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



(ঝ) ধর্মপ্রচার

১। গাঁয়ের বৈরাগী ভিখ পায় না। নিজের দেশের কোন সাধুরই আদর হয় না। ঘরের ছেলে ভাল-ভাল বাজী দেখাতে পারে, ঘরের লোকে তা দেখবে না, কিন্তু দূরের লোক হয়ত তাই দেখেই বাহবা দেবে, পয়সাও দেবে। অনেক গাছ আছে, তার বীজ নিকটে পড়ে না, বহু দূরে গিয়ে পড়ে ও সেখানেই চারা হয়। সাধুদের উপদেশও তেমনি আদৃত হয়, বিদেশে। লণ্ঠনের নীচেই থাকে অন্ধকার, আলোটা দূরে পাওয়া যায়।

২। নিজের মুক্তি শুধু বিশ্বাসের থেকেই হ'তে পারে, কিন্তু অন্যকে মুক্ত করতে হ'লে অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ও অসীম সাধনা আবশ্যক।

৩। যাঁরা খাঁটি ভক্ত, ঈশ্বরের কথা তাঁদের মুখ থেকে আপনি বেরিয়ে আসে। কোন চেষ্টা দরকার হয় না কথা জোগাড় করবার জন্য। কে যেন ভিতর থেকে কথা জুগিয়ে চলেছে, এমনি মনে হয়।

৪। আগুন জ্বালে একজন। কিন্তু আগুন পোহায় আরও পাঁচজন এসে। তেমনি একজন চেষ্টা ক'রে সিদ্ধিলাভ করে, আর পাঁচজন তার সঙ্গ ক'রে, উপদেশ লাভ ক'রে সাধনপথে এগিয়ে যায়।

৫। ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনা থেকেই জোটে। তেমনি



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

কোন সাধক সিদ্ধি লাভ করলে তাকে কষ্ট ক'রে সে-কথা ঘোষণা ক'রে বেড়াতে হয় না। লোকে নিজে থেকেই তা জানতে পারে আর ভিড় করে এসে তাঁর চারি পাশে। এই ভাবে আসল প্রচার আপনা থেকেই হয়।

(ঞ) ধর্মোপলব্ধি

১। যতদিন না ঈশ্বর লাভ হচ্ছে, ততদিনই দরকার শাস্ত্র পাঠ আর শাস্ত্র বিচার। মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের উপর না বসে, ততক্ষণই গুণগুণ করে, ফুলে বসতে পারলেই চুপ। খালি কলসীতে যখন জল ভর্ছে, তখনই তা ভক্‌ভক্ করে। জলে পূর্ণ হ'লে আর শব্দ নেই।

২। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন একদা পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছিলেন---অনেক শাস্ত্র পড়েও অজ্ঞান থেকে যায় অনেকে, এর কারণ কি? ঠাকুর উত্তর করলেন—"শকুন ওড়ে বটে অনেক উঁচুতে, কিন্তু নজর থাকে তার গো-ভাগাড়ে। ভাল-ভাল গ্রন্থ পড়ে বটে, কিন্তু মন থাকে—কামিনী-কাঞ্চনে। তারা কী জ্ঞান লাভ করবে আশা কর?"

গ্রন্থকে তিনি বলতেন, গ্রন্থি। অর্থাৎ—বন্ধন। বেশী প'ড়ে শুধু দম্ভটাই বেড়ে যায়।

৩। পরমহংসদেব একদা এক তার্কিক শিষ্যকে ব'লে-ছিলেন—"তর্ক করতে হয় ত' কেশব সেনের কাছে যাও।



এক-কথায় বিশ্বাস করবার যদি শক্তি থাকে, তবেই আমার কাছে এস।”

৪। যত শাস্ত্রই পড়, বিবেক—বৈরাগ্য ছাড়া ধর্মলাভ হয় না। সৎ আর অসতের পার্থক্য নিরূপণ করে যে বিচারবুদ্ধি, তাই হ'ল, বিবেক। আর বৈরাগ্য হ'ল, বিষয়ে বিতৃষ্ণা। শাস্ত্রে অনেক ধর্মের কথা আছে, কিন্তু শুধু তা প'ড়ে গেলে ধর্মলাভ হয়না। অনুষ্ঠান চাই।

৫। দু'জন লোক আমবাগানে ঢুকল। একজন বাগানের পরিমাণ, গাছের সংখ্যা, সম্ভাব্য দাম, এইসব হিসাব করতে ব'সে গেল, আর-একজন গাছের তলায় ব'সে পেট ভ'রে আম খেতে লাগল। একজন তর্কযুক্তি নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, আর-একজন ভগবানকে উপলব্ধি ক'রে আনন্দ পাচ্ছে। বেশী বুদ্ধিমান কে?

৬। হাটের বাইরে থেকে শোনা যায় একটা একটানা হো—হো শব্দ। ভিতরে কী হ'চ্ছে বুঝতে হ'লে ভিতরে ঢোকা দরকার। তেমনি ধর্মজগতের বাইরে থেকে ধর্ম-বস্তু কিছুই বোঝা যায় না। ওকে নিজের জীবনের সাথে মিশিয়ে নিতে পারলেই তবে সব-কিছু বুঝতে পারা যাবে।

৭। ধর্মকথা মুখে বলা খুব সোজা। হাতে-কলমে অনুষ্ঠান করা শক্ত। ঠিক যেন তবলার বোল। মুখে আউড়ে যেতে সবাই পারে, আঙুলের আঘাতে ঠিক সেই আওয়াজটি বার করুক দেখি!



৮। এক ব্রহ্মচারী অবিরত মুখে 'শিবোহম্, শিবোহম্' করছে দেখে ঠাকুর বললেন—"শিব হ'য়ে তারপর শিবোহম্ বললে মানায়। অকারণ মুখে শিবোহম্ বললে ফল কি? যারা পূরোপূরি সিদ্ধি পায় নি, তাদের উচিত, নিজেকে ভগবানের সমকক্ষ মনে না ক'রে সেবকরূপে চিন্তা করা।" এই কথা শুনে ব্রহ্মচারী সেই থেকে সেবকভাব অবলম্বন করলেন।

(ট) ব্যাকুলতা

১। মনের টান কি-রকম হ'লে ভগবান লাভ হয়? স্বামীর পরে সতীর যে-রকম টান, টাকার উপর কৃপণের যে-রকম টান, বিষয়ের উপরে বিষয়ীর যে-রকমটি টান, সেই-রকম টান যখন ভগবানের উপর হবে—তখনই ভগবান লাভ হবে।

২। মা ছেলেদের হাতে-হাতে খাবার দিয়ে খেলা করতে পাঠিয়েছেন। যে ছেলে খাচ্ছে বা খেলা করছে—তার দিকে মায়ের আর কোন দৃষ্টি নেই। কিন্তু যে খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 'মা, মা' ব'লে কাঁদছে, মা ছুটে এসে তাকে কোলে নেবেন। ভগবান আমাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্য বিষয়-আশয় স্ত্রী পুত্র কত কি দিয়ে রেখেছেন। ওতে ভুলে থাকলে আর ভগবানকে পাওয়া গেল না। ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যদি ভগবানের জন্য কাঁদতে বসি, তবেই ভগবান



এসে কোলে নেবেন।

৩। 'টাকা পেলাম না, ছেলে মেয়ে পেলাম না'—ব'লে কত লোকই ত' কেঁদে মরছে। কিন্তু ভগবানকে পেলাম না ব'লে ক'জনা কাঁদে?

৪। যীশুখৃষ্ট একদা সমুদ্রের ধারে ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল—"প্রভু, কী করলে ভগবানকে পাওয়া যেতে পারে?" যীশু মুখে কিছু না ব'লে লোকটিকে টেনে জলে নামিয়ে জলের তলায় তাকে ঠেসে ধরলেন। যখন বুঝলেন যে, লোকটা এইবারে মরণাপন্ন হয়েছে, তখন তাকে উঠতে দিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"জলের ভিতর তোমার মনের অবস্থা কি-রকম হয়েছিল?" সে বললে—"মনটা আঁকু-পাঁকু করছিল—যেন প্রাণ যায়, প্রাণ যায় অবস্থা।" যীশু বললেন—"যখন ভগবানের জন্য অমনি আঁকু-পাঁকু করবে, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, অবস্থা হবে, তখনই ভগবানকে পাবে, তার আগে নয় বৎস!"

৫। যে তৃষ্ণায় অস্থির হয়েছে, সে যেখানে জল পাবে, খাবে। "এ পুকুরের জল ভাল নয়, আধ ক্রোশ দূরের অমুক পুকুরে গিয়ে জল খাব"—এ-রকম কথা বলতে পারে সে-ই, যার সত্যিকার তৃষ্ণা পায় নি। ধর্ম সম্বন্ধেও ঐ কথা। যার সত্যিকার ধর্ম-তৃষ্ণা নেই, সেই তর্ক আর বিচার নিয়ে



বসে; যার তৃষ্ণা আছে, সে সবই বিশ্বাস ক'রে গলাধঃকরণ করে।

(১) ভক্তি ও ভাব

১। হীরে-মতি লক্ষ-লক্ষ, কিন্তু কৃষ্ণে মতি কয়টা দেখতে পাও?

২। পরিষ্কার কাচে দাগ পড়ে না, ছবিও উঠে না। ফটো তুলতে হ'লে মসলা মাখাতে হয় কাচে। তেমনি মনের গায়ে ভক্তি মাখানো থাকলে তবেই তাতে ভগবানের রূপ ধরা পড়ে। ভক্তিশূন্য যে নির্ম্মল চিত্ত, তাতে তা ধরা পড়ে না।

৩। প্রেমের আবেশ এলে জগৎ ত' ভুল হ'য়ে যাবেই, নিজের জীবন পর্য্যন্ত ভুলে যেতে হবে। এ যদি না হয়, তবে জানবে ভগবানের উপর তোমার প্রেম আসে নি।

৪। আগে ভাব, তারপর প্রেম, তারপর সমাধি।

৫। দেহে যখন ভাব আসে, তখন একটা তোলপাড় অবস্থা হয় দেহে, ঠিক যেমনটা হয় কুঁড়েঘরে হাতী ঢুকলে।

৬। যে ভগবানে ভক্তি রাখে, সে শুধু বলে—"তুমি যেমন করাও, তেমনি করি। তুমি যেমন চালাও, তেমনি চলি।"

৭। ভগবানে মতি যার হয়েছে, সে আর বিষয়কর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে থাকতে পারে না।



৮। সাধক যতক্ষণ চেঁচিয়ে ভগবানকে ডাকছে, ততক্ষণ জানতে হবে সে ভগবানকে পায় নি। ভগবানকে পেলে পরে আর চেঁচামেচি থাকবে না। সে ভাবে গদগদ হয়ে প্রেমাবেশে মৌন হয়ে যাবে।

৯। যতদিন ভগবৎপ্রেম না জন্মাচ্ছে, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়া ততদিনই আবশ্যক। প্রেম যখন আসে, তখন ওসবে আর মতি থাকে না।

(৬) সাধনা ও সংসার

১। পরমহংসদেবকে এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"সংসারে থেকে সাধনা কি ক'রে হ'তে পারে।" ঠাকুর হেসে চিঁড়ে-কোটার গল্প বলেছিলেন। একটি মেয়ে ঢেঁকিতে পার দিচ্ছে, আর-একটি গড়ের ধারে ব'সে গড়ের ভিতর হাত দিয়ে-দিয়ে চিঁড়ে নেড়ে উল্‌টে-পাল্‌টে দিচ্ছে। গড়ের ভিতর হাত ঘোরাতে-ঘোরাতে সে হয়ত আর-এক হাতে ছেলেকে কোলে নিয়ে তাকে মাই দিচ্ছে। মুখে হয়ত কারুর সঙ্গে গল্প বা হয়ত কোন খদ্দেরের সঙ্গে দেনাপাওনার হিসেব করছে। নানা কাজের ভিতরও কিন্তু আসলে তার মনটি রয়ে গেছে, ঢেঁকির মুষলের দিকে, কারণ সে ঠিক জানে যে, দৈবাৎ মুষল হাতে পড়লে হাতখানি জন্মের মত যাবে। কাজেই সে আর যাই করুক, মুষলের প্রতি তার নজর তীক্ষ্ণ ও অব্যাহত। ঠিক ঐরকমভাবে ঈশ্বরের প্রতি যদি তীক্ষ্ণ ও



অব্যাহত নজর রাখা যায়, তবে সঙ্গে-সঙ্গে আর পাঁচটা বিষয়কর্ম্ম করলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু ঐদিক থেকে দৃষ্টিটি সরে গেলেই সর্বনাশ, একেবারে বিষয়-বিষে জর্‌জর্‌ হয়ে নরকে পতন।

২। দুষ্টা স্ত্রীলোক যেমন সংসারের সব কাজ যথাযথ করেও উপপতির কথা সর্বদা চিন্তা করে, হিন্দুস্থানী-মেয়েরা যেমন গল্প করতে-করতে পথ চলে, কিন্তু মাথার দুধের কলসী যাতে ট'লে প'ড়ে না যায়—সেদিকে নজর রাখে কড়া, তেমনি ভাবে সংসার করতে-করতে ভগবানের উপর ভক্তি রাখতে পারলে তবেই পাওয়া যায় মুক্তি।

৩। পাঁকাল মাছ পাঁকের ভিতর বাস করে, কিন্তু তার গায়ে এক বিন্দুও পাঁক লাগে না। প্রকৃত বৈরাগীরা ঠিক সেইরকম। সংসারে বাস করলেও তাদের অন্তরে সংসারের পাপ প্রবেশ করে না

৪। মনের দাঁড়ি-পাল্লার এক-দিকে ভগবান, অন্য-দিকে সংসার। সংসারের ভার কম হ'লে তবেই ভগবানের দিকে মনটা ঝুঁকে পড়তে পারে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



কয়েকটি গল্প

১ সর্বব্যাপী ভগবান।

এক গুরুমহাশয় একদিন ভাবলেন—শিষ্যদের ত' রোজই ভগবানের কথা বলছি, দেখি না কেন ভগবান সম্বন্ধে কার কতটা ধারণা জন্মেছে। তাই ভেবে তিনি সব শিষ্যকে ডেকে সবাইয়েরই হাতে একটি ক'রে সন্দেশ দিলেন। তাদের প্রত্যেককে বললেন—সবাইকে এই সন্দেশটি এমন নিরিবিলি জায়গায় ব'সে খেতে হবে, যাতে কেউ না দেখতে পায় খাওয়ার সময়। যদি এইরকম ভাবে নিরিবিলিতে ব'সে খেতে পার, তবে আমায় এসে বলবে, আমি তোমাদের আরো-আরো সন্দেশ দেব।

সব ছেলেই ত' আনন্দে আত্মহারা সোজা কাজ! নিরিবিলিতে ব'সে খাওয়া আর এমন কি শক্ত? কেউ সন্দেশ হাতে ক'রে সোজা মাঠে চ'লে গেল—বিলের ধারে কেউ নেই তখন, সেখানে দাঁড়িয়ে টপ্ ক'রে খেয়ে ফেললে সন্দেশটা। কেউ জলের ভিতরে ডুব দিলে সন্দেশটি হাতে ক'রে, ডুবিয়ে-ডুবিয়েই সন্দেশ খেলে। কেউ কোন ঝামেলার ভিতরই গেল না, চট্ ক'রে সন্দেশ নিয়ে ঘরে ঢুকে দোর জানলা বন্ধ ক'রে দিলে, ব্যস্! কে আর দেখবে? অন্ধকারে ব'সে সন্দেশের সদ্ব্যবহার করলে।

তারপর সবাই এসে পরের দিন হাসিমুখে গুরুমহাশয়ের



সমুখে দাঁড়াল। আরও সন্দেশ দেবেন কথা আছে। নিরিবিলিতে খেয়েছি ত'!

কেবল একটি ছেলে কাঁচুমাচু শুক্‌নো মুখে এসে নীরবে দাঁড়াল গুরুর সমুখে। গুরু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বাবা? কি হয়েছে? মুখ শুক্‌নো কেন? শিষ্য বললে—গুরুমশায়! আমি নিরিবিলি জায়গা পেলাম না। আপনার সন্দেশ খেতে পারি নি, আর আপনার দেওয়া সন্দেশ আগে না খেয়ে অন্য খাবার ত' মুখে তুলতে পারি নে, কাজেই আমায় উপবাসী থাকতে হয়েছে কাল থেকে।

গুরু অবাক, এবং ছেলেরা হেসে কুটিকুটি। কী কাণ্ড! ছেলেটা এত বোকা! কেউ বললে, "মাঠের ভিতর গেলেই পারতিস", কেউ বললে, "জলে ডুবিয়ে খেলিনে কেন?", আবার কেউ-বা বললে, "ঘরে দোরজানলা বন্ধ ক'রে নিলেই ত' হ'ত রে বোকা।"

ছেলেটি তাদের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে বললে—"সব চেষ্টাই আমি করেছি ভাই! মাঠের ভিতর জনপ্রাণী ছিল না, কিন্তু নীলাকাশ থেকে একজোড়া চক্ষু আমাকে দেখছে---তা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম! জলের ভিতরেও ডুব দিয়ে দেখেছি--সেখানেও সেই চক্ষু! ঘরের ভিতর ত' মনে হ'ল--ছাদের আবরণ ভেদ ক'রে বাইরে থেকে কার জ্বলন্ত চাহনি আমার সর্বাঙ্গ স্পর্শ করছে। আমার সন্দেশ কিছুতেই খাওয়া হ'ল না।"



গুরু তাকে আলিঙ্গন করলেন। আশীর্বাদ করলেন—ভগবানের চক্ষু তুমি দেখতে পেয়েছ, ঐ চক্ষু সর্বদাই তোমার উপর দৃষ্টি রাখবে, তোমার আর ভয় নেই বৎস!

(২) হিংসা ও অহিংসা।

এক সাধু মাঠের ভিতর দিয়ে যান। দূর থেকে রাখালেরা চেঁচিয়ে বললে—"সাধুজী, ওখান দিয়ে যাবেন না। ওখানে এক গর্ত্তে ভীষণ এক সাপ আছে। দেখলেই সে কামড়াবে, আর সে কামড়ালে আর রক্ষে নেই!" সাধু ভ্রূক্ষেপ করলেন না, সোজা এগিয়ে চললেন সেই পথে, অবিলম্বে সেই ভীষণ বিষধর কোথা থেকে ছুটে এলো ফণা তুলে। যেমন সে সন্ন্যাসীর পায়ে ছোবল মারতে উদ্যত হয়েছে, অমনি তিনি এক মুঠি ধূলো ছুঁড়ে মারলেন তার মাথায়। ব্যস, অমনি মহাসর্প নির্বীর্য্য হ'য়ে লুটিয়ে প'ড়ল তাঁর পায়ে!

তখন সন্ন্যাসী সাপের বোধগম্য ভাষায় তাকে উপদেশ দিতে লাগলেন। অহিংসার মর্য্যাদা বুঝিয়ে দিলেন। সাপ সন্ন্যাসীর কাছে প্রতিজ্ঞা করলে আর সে কখনো হিংসা করবে না কাউকে।

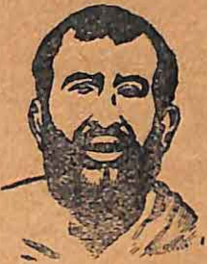
সন্ন্যাসী চ'লে গেলেন। সাপ আর গর্ত্ত থেকে বেরোয় না, কখনো যদি-বা বেরোয়, লোক দেখলেই নিজে থেকে স'রে যায় —পাছে কোন দুর্বল মূহূর্তে স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তি বশে সে কাউকে দংশন ক'রে বসে। সাপের এই নিরীহ ভাব দেখলে



রাখালেরা। যারা তাকে আগে যমের মত ভয় করত, ত্রিসীমা মাড়াত না, তারাই আজ তাকে দূর থেকে ঢেলা মারে, কেউ-বা তার অপসৃয়মান দেহের পিছনে তাড়া ক'রে যায় লাঠি হাতে। ইট-পাটকেল খেয়ে সাপ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেল, তবু কোনদিন কাউকে আর তাড়া করে না সে। অবশেষে লোকের সাহস এমনি বেড়ে গেল যে, একদিন একটা ছেলে তার লেজ ধ'রে তাকে আকাশে ঘোরাতে-ঘোরাতে শেষে ছুঁড়ে ফেলে দিলে একটা গাছের গায়ে। সাপের মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল। তার হাড়-গোড় গেল চুর্ণ হ'য়ে। সে মরার মত সেইখানে প'ড়ে রইল।

দৈবক্রমে সেই সন্ন্যাসী সেই পথে এলেন আবার। তিনি দেখলেন, সাপ মরার মত প'ড়ে আছে গাছের তলায়। তিনি পদ্মহস্ত গায়ে বুলিয়ে তাকে সুস্থ ক'রে তুললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—"তোর এ দশা কেন বাছা"? সাপ কেঁদে বললে, 'গুরু! তোমার কাছে মন্ত্র নিয়ে অবধি আমার হাড়ির হাল!' এই ব'লে সে লোকের দৌরাত্ম্য সবিশেষ বর্ণনা করলে।

সাধু বড় আপশোষ করলেন। শেষে সাপকে ভর্ৎসনা ক'রে বললেন—"হাঁরে বোকা! আমি তোকে ত' ফোঁস করতে নিষেধ করিনি! নিষেধ করেছিলাম কামড়াতে! দুষ্ট লোককে ভয় দেখাতে হবে বই-কি! তা নইলে তারা যে মাথায় চ'ড়ে



ব'সবে! তুই কাছে লোক দেখলেই তাকে ভয় দেখাবি, তাতে আমার সম্পূর্ণ অনুমতি রইল। নিষেধ কেবল কামড়ানোতে!"

পরদিন সাপটার দশা দেখতে যেমন এল রাখালেরা, অমনি সে কুলোপানা চক্র তুলে গর্জন ক'রে উঠল। আর বাপ্‌রে ব'লে সবাই দে টেনে ছুট! সাপ তখন নিশ্চিন্ত মনে অহিংসার সাধনা ক'রতে লাগল।

(৩) গোপীভাব

নারদ ঋষির মনে মহা অভিমান—ভাবেন তাঁর মত সাধক ভক্ত আর কেউ নেই। ভগবান অন্তর্য্যামী, নারদের মনের ভাব বুঝতে পেরে মনে মনে হাসেন।

একদিন নারদ হরিগুণ গান করতে করতে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত। গিয়ে দেখেন—আশ্চর্য্য! স্বয়ং ভগবান অসহ্য শিরঃপীড়ায় কাতর! নারদ আকুল হ'য়ে ব'ললেন—"প্রভু! কিসে তোমার এ পীড়ার উপশম হবে? আজ্ঞা কর—আমি এক্ষুণি তাই ক'রছি।"

ভগবান কাতরা'তে-কাতরা'তে ব'ললেন—"কারো পায়ের ধূলো এনে আমার মাথায় দাও, এক্ষুণি ব্যথা সেরে যাবে।" নারদ বজ্রাহত! প্রভুর মাথায় পায়ের ধূলো কে দেবে? সে দাঁড়িয়ে নরকস্থ হবে না যাই হ'ক, উপায় নেই! প্রভু যখন ঔষধ ব্যবস্থা ক'রেছেন, তখন তা সংগ্রহ করবার একটা চেষ্টা ক'রতেই হবে ত!



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

নারদ শিবলোকে গেলেন, মহাদেবের বা মা ভগবতীর পায়ের ধূলোর জন্য ! তাঁরা জিভ কা'মড়ে কাণে আঙ্গুল দিলেন। শ্রীবিষ্ণুর মাথায় পায়ের ধূলো দিতে হবে ? তাঁরা তখুনি ভগবানকে দেখবার জন্য বৈকুণ্ঠে ছুটলেন বটে, কিন্তু পদধূলি দিলেন না। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাও তাই ক'রলেন।

মরীচি, কশ্যপ, পুলহ, পুলস্ত্য প্রভৃতি দেবর্ষিরাও ঝেড়ে অস্বীকার ক'রলেন। প্রভুর মাথায় পায়ের ধূলো দিতে হবে ? এ কল্পনাও পাপ ! নারদ ত্রিভুবন ঘুরলেন ! নাঃ—কারও সাহস হ'ল না প্রভুকে পায়ের ধূলো দেবার !

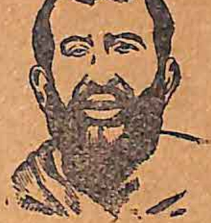
অবশেষে নারদ এলেন বৃন্দাবনে। নেহাৎ রাস্তায় প'ড়েছিল জায়গাটা—তাই ! সেখানে গোপীরা সমাচার জিজ্ঞাসা ক'রলে তাদের চির-পরিচিত কেলেসোনার ! নারদ তখন মেজাজ খারাপ ক'রে বসে আছেন। প্রভু শিরঃপীড়ায় ছটফট ক'রছেন ওদিকে ! আর ত্রিভুবনে কোথাও ঔষধ মিলল না।

তিনি তিক্ত স্বরেই প্রভুর সমাচার ব'ললেন গোপীদের কাছে।

হরি হরি ! গোপীরা জনে-জনে পা বাড়িয়ে দিল ! আহা ! কেলেসোনার অসুখ ? আর এই তুচ্ছ পায়ের ধূলো দেবার একটা লোক স্বর্গে নেই ? দেবতাগুলো যেন কী রকম !

গোপীদের স্পর্দ্ধা দেখে নারদ স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন বটে, কিন্তু গোপীরা পা বাড়িয়ে দিয়েছে, ধূলো না নিয়ে উপায় নেই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



নিজের গেরুয়ার অঞ্চলে এক রাশ পায়ের ধূলো নিয়ে তিনি বৈকুণ্ঠে উপস্থিত! প্রভু কাতরা'তে-কাতরা'তে জিজ্ঞাসা ক'রলেন —"পেয়েছ পায়ের ধূলো?"

নারদ উত্তরীয় মেলে ধরতেই প্রভু নিজের হাতে সেই গোপীপদরজঃ নিয়ে মাথায় মাখতে লাগলেন। একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি—সেরে গিয়েছে তাঁর শিরঃপীড়া!

নারদের দিব্য জ্ঞান উদয় হ'ল। এই গোপীরা তাঁর চেয়ে কত উপরে!

এরা শ্রীভগবানের একান্ত আপনার, অভেদ ব'ললেই হয়!

* * * * *

পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আর একটি মাত্র বিষয়ের অবতারণা ক'রে আমরা এই ক্ষুদ্র জীবনীর উপসংহার ক'রব। সেটি হ'ল—তাঁর কীর্ত্তিমান শিষ্য শ্রীবিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় আধ্যাত্মিক সংস্রবের কথা। জীবদ্দশায় ঠাকুর একাধিক বার নরেন্দ্রনাথকে ব'লেছিলেন—"আমার অসম্পূর্ণ কাজ তোকেই শেষ করতে হবে। সকল পথেই ভগবানের আরাধনা আমি করেছি, করিনি কেবল মানুষের ভিতর ভগবানের সাধনা। সেইটি রইল তোর জন্য।" তখন সে কথার তাৎপর্য্য নরেন্দ্র বা অন্য কারও বড় একটা বোধগম্য হয় নি। হ'ল তাঁর তিরোধানের পর তখন নরেন্দ্রনাথ হ'লেন বিবেকানন্দ। দেশময় দুর্গত নর নারীর সেবায় তিনি নিয়োজিত ক'রলেন তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি।

নব্য ভারতের স্রষ্টারূপে যে দু'টী বাঙ্গালী মহাপুরুষের আবির্ভাব হ'য়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শুভলগ্নে, তাঁরা হলেন রামমোহন ও বিবেকানন্দ। আবার বিবেকানন্দের যা-কিছু সুমহৎ কর্ম্মপ্রচেষ্টা, তার প্রেরণা এসেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা



থেকে। সে শিক্ষা ঠাকুরের দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হ'য়ে যায় নি। পরবর্ত্তী জীবনেও বিবেকানন্দ প্রত্যেকটি সংশয়ের মূহুর্ত্তেই উপলব্ধি করেছেন গুরুর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য, লাভ ক'রেছেন গুরুর নির্দেশ বা আশীর্বাদ। চিকাগো ধর্ম-মহামণ্ডলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব ক'রতে যাবেন বিবেকানন্দ — এই প্রস্তাব যখন হ'ল, তখন স্বয়ং বিবেকানন্দ হয়ে উঠলেন সংশয়ে আকুল। নিঃসম্বল নির্বান্ধব ভারতীয় সন্ন্যাসীর পক্ষে ধরণীর অপর প্রান্তে গিয়ে বেদান্তব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে বস্তু-তান্ত্রিক পাশ্চাত্যকে মুগ্ধ করা সম্ভব হবে কি? সে সংশয়ের নিরসন ক'রবার জন্য সুক্ষ্মদেহী গুরুকেই সেদিন মর্ত্তে আগমন করতে হ'য়েছিল একবার। স্বপ্নাবেশে বিবেকানন্দ দর্শন করেছিলেন—গুরুদেব পদব্রজে সমুদ্রবক্ষ অতিক্রম ক'রে চ'লেছেন অজ্ঞাত দেশের পানে!

আরও একবার! ধর্মমহামণ্ডলের অধিবেশনে বক্তৃতা দেওয়ার পূর্বদিন বিবেকানন্দ কিছুতেই স্থির ক'রতে পারছেন না—ধরণীর শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের সম্মুখে কোন্ তত্ত্বের আলোচনা কী ভাবে করবেন তিনি। বিনিদ্র রজনী কেটে যাচ্ছে গভীর চিন্তায়, এমন সময়ে তিনি স্পষ্টই শুনলেন—গৃহ-প্রাচীরের ভিতর দিয়ে তাঁর গুরুরই কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হ'চ্ছে বেদান্তের মহান বাণী।

পদে পদে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের এই অন্তরের যোগ পুণ্যভূমি ভারতেই দুই চারিবার দেখা গিয়েছে। আর বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে তা দেখা গিয়েছিল বলেই তরুণ ভারতের সম্মুখে তিনি স্থাপন ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলেন নতুন এক জীবনের আদর্শ!